প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ কর্নওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
দ্বিজেন বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
রয়েল হাফটোন
৪ সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৬

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

সুরমা দেবী তাঁর স্বামীর ঘরে কোনওকালে একত্র বসবাস করলেন না, এটি তাঁদের আত্মীয়পরিজন, কুটুম্ব এবং বন্ধুমহলে সকলেই জেনে এসেছে। এ সংবাদ গোপন নয়, এটিকে কেউ চাপা দেবারও চেষ্টা পায় না, এবং এই নিয়ে যত প্রকারের জনশ্রুতি, গুজব, কানাকানি ও কলঙ্ক রটনা প্রচলিত ছিল, কালক্রমে অল্পে অল্পে তার সমস্ত ধার ক্ষয়ে গেছে।

সুরমা দেবীর দুটি সন্তানের মধ্যে ছেলেটি মানুষ হয়েছিল বাপের কাছে। মেয়েটি মায়ের কাছ ছাড়া হয়নি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কৌতুকের বিষয় ছিল এই যে উভয়ের পরস্পর দেখাশুনো হলে খুশীর হাওয়া বইত এবং উভয়ের মধ্যে একটি সম্ভ্রমাত্মক আলাপ-আলোচনা চলত। কিন্তু সে এক দিন কিংবা দুদিন। তারপরেই জানা যেত, সুরমা দেবী তাঁর কন্যাসহ পিত্রালয়ে পৌঁছে গেছেন। অথচ কলহ, মনোমালিন্য, বিসংবাদ কোনটার খবরই কিছু পাওয়া যেত না। কিন্তু মোটা কারণটা প্রায় সবাই অনুমান করে নিত, সুরমা দেবীর পিতৃগোষ্ঠী হলেন হাল আমলের ধনী এবং তাঁর স্বামী নরেশবাবুরা হলেন পড়তি ঘর!

পার্থক্যটা চোখে দেখা যেত বলেই এটাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু তবু এ কথাটা সত্য নয়। এর মূল কারণটা কোথায়, এটা কেউ তলিয়ে ভাবেনি,—শুধু আমিই জানতুম।

ত্রিশ বছর আগে কোনও এক দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক কি এক অজ্ঞাত কারণে কেন মধুর হয়ে উঠতে পারল না, আমি সেই ইতিহাস অবশ্য বলতে বসিনি। কিন্তু এটি দাঁড়িয়ে দেখলুম, নরেশচন্দ্রের ছেলে সোমেন্দ্র মানুষ হয়ে উঠল কঠোর দারিদ্র্য ও

দুঃখের মধ্যে, এবং তাঁর মেয়ে শুভার বিবাহ হয়ে গেল মস্ত এক ধনী অভিজাত পরিবারে। বিবাহের দিন নরেশবাবু প্রসন্ন হাস্যে গঙ্গাস্নান ও আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ সেরে এসে যথাসময়ে কন্যা সম্প্রদান কার্য সেরে গেছেন! সুরমা দেবী চিরদিনের মতো শান্ত চক্ষে দাঁড়িয়ে সমস্তটাই পর্যবেক্ষণ করেছেন!

আমি দেখেছি সেই রাত্রে বিদায় নেবার আগে সানন্দচিত্তে নরেশচন্দ্র এবং সোমেন্দ্র উভয়ের আহারকালে সুরমা দেবী উপস্থিত ছিলেন।

এ ঘটনা পাঁচ বছর আগেকার।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে নরেশচন্দ্র পরলোকগমন করেছেন। সুরমা দেবীর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। শুভা তার স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ করে ফিরেছে। সুরমা দেবীর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। শুধু সোমেন্দ্র রয়ে গেছে একটা সমস্যা ও মীমাংসার মাঝামাঝি। এর আনুপূর্বিক চেহারাটাও কেবল আমিই জানতুম।

ভয় করে, পাছে আমার বলবার দোষে এঁদের পারিবারিক জীবনের ইতিবৃত্তটা সঠিকভাবে ব্যক্ত না হয়। এঁরা সকলেই জানেন, এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি কি অকৃত্রিম।

সোমেন্দ্র তার দু'বছর বয়স থেকে অদ্যাবধি জননীর কাছাকাছি থাকেনি। দূরের থেকে সে মধ্যে মধ্যে সুরমাকে দেখেছে, কিন্তু অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে উভয়ের কেউ একান্ত কাছাকাছি আসেনি। হয়ত অদৃশ্য বাহু মেলে দুজনে দুজনকে কখনো বা আকর্ষণ করতে চেয়েছে, কিন্তু সেটির প্রমাণ কোথাও নেই। সন্তানের জন্য প্রকাশ্যে মা কাঁদেনি কোনদিন, এবং বছর পনেরো বয়সের পর থেকে জননীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সোমেন্দ্র আর ভ্রূক্ষেপও করেনি।

সোমেন্দ্র মানুষ হয়ে উঠেছে নিরন্ন নরেশচন্দ্রের দরিদ্র আবহাওয়ায় -যেখানে প্রাণ ধারণের সমস্যা ছিল প্রবল। নরেশচন্দ্র তাঁর ঘরেই একটি পাঠশালা বসিয়েছিলেন। এছাড়া ছিল তাঁর কয়েকজন শিষ্যসেবক। ঘরে ছিলেন বৃদ্ধা ও নিঃসন্তান বিধবা ভগ্নী। একবেলা মাত্র ঘরে নিরামিষ রান্না হত। নাবালক সোমেনকে ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্নার জোগাড় এবং বাসনমাজা, জলতোলা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করতে হত। এমন নয় যে, সুরমা দেবী এই দরিদ্র ঘরে এসে এক আধবার দাঁড়াতেন না! বরং তিনি শুভাকে সঙ্গে নিয়েই ক্বচিৎ কখনো বিনা নোটিশে এসে হাজির হতেন! আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি সোমেনের দুই উৎসুক চোখে ও মুখের চেহারায় কি একটা অব্যক্ত বিস্ময়! সুরমার সালঙ্কারা ও সুবেশা মূর্তি এবং শুভার সর্বাঙ্গে বহুমূল্যবান পরিচ্ছদ! উভয়পক্ষে বিবাদ ঘটেনি, মনোমালিন্য প্রকাশ পায়নি,—দুচারটি কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পরে আবার তাঁরা বিদায় নিয়েছেন! সহোদরের দিকে সোৎসাহে শুভা দুপা এগিয়ে গেছে, কিন্তু সোমেন্দ্রর শান্ত এবং নিস্পৃহ মুখের দিকে চেয়ে সে তিন পা পিছিয়ে চ'লেও এসেছে। জননী ও সন্তান, সহোদর ও সহোদরা, স্বামী ও স্ত্রী,—এইভাবে দূরে দূরে সরে রইল, এবং উভয়পক্ষের মাঝখানে এই দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করার জন্য কোনও সেতুবন্ধও ছিল না।

এইভাবে কেটে গিয়েছে অনেককাল—

বিস্ময়ের কথা এই, বিগত কয়েক বৎসরের ভিতরে এমন দুএকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে যার অনুপূর্বিক কার্যকারণযোগ সম্ভবত নরেশচন্দ্রেরই জানা ছিল। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে ডেকে এগুলি অবশ্য বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আমি এ নিয়ে কোথাও আলোচনা তুলিনি।

সোমেন্দ্র তার কিশোর বয়স থেকে বিশেষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত

হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভ করতে গেলে যে তার বাধা-বিপত্তি অনেক, এবং শিক্ষামাত্রই যে অতিশয় ব্যয়বহুল,—একথাটি বোধকরি ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং পাঠশালার শিক্ষক নরেশচন্দ্রের তেমন জানা ছিল না। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান সোমেন্দ্রর শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বহুলাংশে নিরাসক্ত ছিলেন এবং সোমেন যখন একটির পর একটি পরীক্ষায় জলপানিসমেত পাস করে এগিয়ে যাচ্ছিল, এবং তাঁর বাড়িতে অর্ধাশন সত্ত্বেও স্বাস্থ্যের গৌরবে, দেহের উচ্চতায়, স্বভাবের মিষ্টতায় পারিপার্শ্বিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল,—তখনও তিনি একটিবারও ভাবলেন না, ছেলের সর্বপ্রকার খরচপত্র অন্তরাল থেকে কে জোগাচ্ছে! তাঁর ঘরের অভাব অভিযোগ তেমনি অব্যাহত রয়েছে, এবং তেমনি রয়েছে তাঁর ছেলে কর্তব্যপরায়ণ, মনোযোগী, মিষ্টভাষী এবং গৃহগতপ্রাণ,—কিন্তু কেমন একটা স্বাচ্ছল্যের ভিতরে সে যেন এসে পৌঁছেছে। জলপানির টাকায় এ বাজারে যে এতগুলি সামগ্রী একসঙ্গে হয় না, এটি নরেশচন্দ্র জানতেন। শুধু এইটুকু তিনি জানতেন না, কোন্ যাদুমন্ত্রে তাঁর ঘরের চেহারা বদলায়, দুইবেলা রান্নাবান্না হয়, শীতের দিনে বৃদ্ধা ভগ্নীর গায়ে গরম চাদর জোটে, এবং বাড়ির কাজকর্মের জন্য একটি চাকর মোতায়েন করা হয়।

আমি নিশ্চিতভাবেই জানতুম, সুরমা দেবীর সঙ্গে সোমেন্দ্রর কোনওপ্রকার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ইদানীং মাতা ও পুত্রের মধ্যে সাক্ষাৎকারও ঘটে না।

সোমেন্দ্রর বাইশ বছর বয়স অতিক্রম করার আগেই নরেশচন্দ্র হঠাৎ একদিন ছেলের বিবাহ দিলেন। মেয়েটি তাঁর এক বন্ধুকন্যা, এবং উভয়ের বয়সের পার্থক্য সামান্যই। মেয়েটি সুশ্রী এবং শিক্ষিতা।

এই প্রথম একটি নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হল। এই বিবাহের

প্রতিবাদ করার জন্য সোমেন্দ্র প্রথম মাথা তুলল এবং তার সেই অস্থির ও অসন্তুষ্ট চেহারাটা আমি প্রত্যক্ষ করলুম। বিবাহ করতে কোনও মতেই সে প্রস্তুত নয়, কিন্তু পিতার অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

বিবাহের খবর গেল সুরমা দেবীর কাছে এবং তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিলেন, এ বিবাহ তিনি মঞ্জুর করেন না।

নরেশচন্দ্রের প্রকৃতির কঠোরতা আমার জানা ছিল, আমি গিয়ে সুরমা দেবীকে সে কথা বিশদভাবেই জানালুম। কিন্তু তাঁরও জিদ কম ছিল না। জানিয়ে দিলেন, এ বিবাহে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বিবাহের বরযাত্রীদলের সঙ্গে ছিলুম আমি। কলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে একটি গ্রামে অবস্থাপন্ন এক পরিবারে এই বিবাহ ঘটেছিল। শুভদৃষ্টির কালে আমি স্পষ্ট দেখছিলুম, নববধূর চোখ দুটি কোমল, শান্ত এবং অশ্রুরেখাহীন। কিন্তু অন্যদিকে বাইশ বছরের সৌম্যদর্শন সোমেন্দ্রের দুই চক্ষু দিয়ে নেমে এসেছে অশ্রু দরদরিয়ে।

ওই জনতার ভিতরে দাঁড়িয়ে একমাত্র আমিই দুর্ভাগ্যক্রমে এই অশ্রুর রহস্য জানতুম। কিন্তু ভাগ্যের ক্রীড়নক কে নয়? এই শুভদৃষ্টির কালে শুধু যে ছেলেটার চোখ দিয়েই জল গড়াল তাই নয়,—হয়ত অন্তরালে এখানে ওখানে আরও কেউ কেউ ছিল যাদের চোখও শুষ্ক থাকেনি।

এই বিবাহের অনতিকাল পরে গ্রামে এবং শহরে কানাকানি একটা রটেছিল বৈকি। শুভদৃষ্টির কালে নতুন বরের চোখ দিয়ে জল গড়ায়,—একথা কেউ কোথাও শুনেছে কি? কচি ছেলে বুঝি মায়ের কোল ছাড়া কিছু জানে না? এমন আদুরে ছেলের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলেই হত?

চুপ করে আমি কথাগুলি শুনেছিলুম।

পুত্রের বিবাহের এক বছরের মধ্যে নরেশচন্দ্র হঠাৎ একদিন মারা-যান। অনেকে বলে, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কেউ কেউ প্রচার করে, তিনি বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন; তাঁর ন্যায় প্রতারক ভূভারতে নেই। একটি নিরপরাধ মেয়ের জীবনকে তিনি ধ্বংস করেছেন। তাঁর পুত্রের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বিবাহের যূপকাষ্ঠে পুত্র ও পুত্রবধূকে বলি দিয়েছেন!

শোচনীয় বিক্ষোভ এবং অপযশের মধ্যে নরেশচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। তারপর তিন বছর পেরিয়ে গেছে।

সুরমা দেবী সম্প্রতি তাঁর রিজেন্ট পার্কের নবনির্মিত বাড়িটিতে উঠে এসেছেন। বাড়িটির চেয়ে বাগানের অংশটুকু বড়,—এবং সেই বাগানেব জন্য মালী নিযুক্ত আছে। বাড়িটি তিনতলা এবং তিনটি ফ্ল্যাট সংযুক্ত। নীচের তলায় থাকেন একটি পাঞ্জাবী পরিবার এবং তিনতলার ফ্ল্যাটে আছেন জনৈক মাদ্রাজী অফিসার। দোতলার সমগ্র ফ্ল্যাটটি নিয়ে থাকেন সুরমা দেবী। বাগানের প্রান্তে চাকর-বাকরদের ঘরের পাশাপাশি কয়েকটি গ্যারাজ আছে। তার একটিতে সুরমা দেবীর একখানা গাড়ি থাকে। ড্রাইভারকে নিয়ে মোট চারজন লোক তাঁকে রাখতে হয়েছে। তাঁর ছোট ভাই রবিনের ছোট মেয়ে অমিতা থাকে তাঁর কাছে। এখান থেকেই সে ইস্কুলে যায়। শুভা ও তার স্বামী হিরণ্ময় মাঝে মাঝে আসে তাদের গাড়ি হাঁকিয়ে। সুরমা দেবীর বাবা মারা যাবার আগে কন্যার জন্য বেশ মোটামুটি সংস্থান ক'রে গেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, সোমেন্দ্রই একবার আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমার দাদামশায়ের অবস্থা এতই যদি ভাল, তাহলে আমার বাবার মতন দরিদ্র ব্রাহ্মণের হাতে তিনি মেয়ে দিয়েছিলেন কেন?

হাসিমুখে বলেছিলুম, বিগত যুদ্ধে সকলেরই ভাগ্যের চাকা ঘুরে

গেল যে ? যারা মধ্যবিত্ত তারা নীচে নামল, যারা অবস্থাপন্ন তারা ওপরে উঠল। তোর দাদামশাই একটার পর একটা মিলিটারি কনট্রাক্ট পেতে লাগলেন। দেখছিস নে, সেই লোভেই ত আজ আবার একদল লোক যুদ্ধ চাইছে!

সোমেন্দ্র চুপ ক'রে গিয়েছিল।

সুরমা দেবী আজ আমাকে বিশেষ কারণে গাড়ি পাঠিয়ে ডেকেছিলেন। আমি এসে যখন পৌঁছলুম তখনও পাঁচটা বাজেনি। ওপরে উঠে এসে দেখি, বাগানের গোলাপ আর সূর্যমুখী বাগানে আর নেই, সবই উঠে এসেছে দোতলার ফ্ল্যাটে। অমন লম্বা করিডরের দুধারে একটির পর একটি পুষ্পাধার সাজানো। মখমলের পর্দাগুলি যেন উৎসবসজ্জার আভাস দিচ্ছে। আল্‌সাসিয়ান্ কুকুরটা একটি চামড়ার শিকলে এককোণে বাঁধা। ঝি-চাকর-ঠাকুর—এরাও উপযুক্ত সাজসজ্জা করেছে। অমিতার ভাই-বোনরা এসেছে। রবিনের দাদা সতীশ এসেছেন সপরিবারে। দোতালাটা জমজম করছিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রথমেই দেখছি মিলি মিত্র, বাসনা চৌধুরী, রমি দত্ত, কল্যান চাটুয্যে এবং আরও কয়েকজন মেয়ে-পুরুষকে। দোতলার উত্তর দিকে বড় লাউঞ্জে আজ মস্ত জলযোগের আসর বসেছে।

লাউঞ্জের দিকে যখন এগিয়ে এসেছি, তখন সকলের মধ্যে যে উচ্চরোলটা দেখা গেল, সেটির কেন্দ্র হলুম আমি। ওদের সকলের এই ধারণা, ওরা নাকি সবাই নানাবর্ণের ফুল এবং আমি হলুম সর্বাপেক্ষা সেই অবহেলিত বস্তুটি,—অর্থাৎ মালা গাঁথবার সূতো। সতীশচন্দ্র সোৎসাহে বললেন, তুমি না এলে কারো সঙ্গে কারো যোগ ঘটে না!

উপরের বারান্দায় দাঁড়ালে বাগান পেরিয়ে ফটকের দিকে চোখ পড়ে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সুরমা দেবী অধীর ঔৎসুক্য নিয়ে

এক-একবার এধার থেকে ওধারে আনাগোনা করে যাচ্ছেন। আমি তাঁর মনের চেহারাটা জানতুম; কিন্তু আজকের এই জলযোগের আসর বসাবার মূল কারণটা সঠিকভাবে আমার জানা ছিল না।

এক সময় সুরমা আমাকে একটু অন্তরালে ডাকলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, তুমি কি খবর কিছু পেয়েছ?

মুখ তুলে আমি তাকালুম।

তিনি পুনরায় বললেন, সোমেন যে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে, তুমি শোননি?

বললুম, শুনেছি। আমার ওখানে একদিন গিয়েছিল।

সুরমা কতক্ষণ চুপ করে গেলেন। পরে বললেন, তুমি কি জান, সে তার শ্বশুরবাড়ি আনাগোনা করছে কিনা?

আমি হাসলুম। বললুম, জামাই যদি শ্বশুরবাড়ি যায় তাহলে আশ্চর্য হবার কি আছে? তার স্ত্রী রয়েছে সেখানে—

সুরমা দেবীর মুখে চোখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর উত্তেজনাকে কোনো মতেই প্রকাশ পেতে দিলেন না। বরং ঈষৎ শান্ত কণ্ঠেই বললেন, তুমি বোধ হয় খোঁজ পাওনি, ওদের মধ্যে এখন আর কোনও সম্পর্কই নেই!

বললুম, যদি না থাকে তবে দুর্ভাগ্যের কথা! নারায়ণ আর অগ্নিসাক্ষী করে একদিন সকলের মাঝখানে ওদের বিয়ে হয়েছিল!

সে ত' বটেই—একশ'বার,—সুরমা দেবী চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে বাইরের ফটকের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, তোমার অজানা কিছু নেই। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরের আগাগোড়া সব তুমি জান। আজ আমি ছেলেকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছি। কেননা মা জানল না তার ছেলে কেমন, চোখে দেখল না তার পুত্রবধূ কেমন,—ছেলে জানল না তার মা কেমন!

স্থরমা চলে যাবার পর মিলি মিত্র এক ফাঁকে আমার দিকে এগিয়ে এসে খপ করে পায়ের ধূলো নিল। বললুম, কি রে, তোর সাজসজ্জা এমন শাদামাটা যে? পাউডার সুর্মা কই? সেই সর্বনেশে জামা কই? কি হল তোর?

শান্ত মুখখানা তুলে মলিন হেসে মিলি বলল, সাজবো কা'র জন্যে? তোমার মাথা ঘোরাবার জন্যে?

আমি হা হা করে হেসে উঠলুম। বললুম, ওরে পোড়ারমুখি, এখনো আমার দিকে তোর চোখ পড়ে রয়েছে? এবার আমি গলায় দড়ি দেবো।

তা দিয়ো,—মিলি বলল, সেই দড়ি ধরে আমিই তোমাকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াব! শোন, কথা আছে—

মিলি আমাকে নিয়ে গেল স্থরমা দেবীর শয়নকক্ষের ভিতরে। সেখানে এসে একস্থলে দাঁড়িয়ে সে বলল, সকলের সামনে যদি আমি আজ অপমানিত হই, তুমিও চুপ করে থাকবে?

মিলির সর্বপ্রকার সমস্যা আমার জানা ছিল। তার কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে বললুম, আজ এখানে তুই না এলেই পারতিস, মিলি।

মাসিমা আমাকে জোর করে এখানে এনেছেন!

মিলির কথা শুনে আমি এই চায়ের আসরের প্রকৃত তাৎপর্যটা যখন অনুধাবন করছিলুম, সেই সময় মিলি হঠাৎ আমার গায়ের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল, তুমি আমাকে বাঁচাও, আমাকে মুক্তি দাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি এই নরকে নামব জানলে এমন ক'রে জীবনটাকে নষ্ট করতুম না!

বাইরের দিকে ঈষৎ সোরগোলের আওয়াজ পাওয়া গেল। মিলি সচেতন হয়ে চোখ মুছল। আমি বললুম, কাঁদিসনে ভাই, চুপ কর। তুই ছেলেমানুষ ছিলি তাই বুঝতে পারিসনি। তুই

ছিলি সামান্য ঘুঁটি, জুয়াখেলার উপকরণ। প্রথম থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তোর পক্ষে বোধ হয় ভালই হত।

মিলি বলল, ভালবাসাই যদি আমার হয়, সে কি আমার পাপ?

হেসে বললুম, মিলি, পাপ কিনা জানিনে। তবে ভালবাসলে তার মূল্যও কিছু দিতে হয়। আয়, বাইরে যাই। সোমেন এসেছে বোধ হয়।

লাউঞ্জে এসে দেখি সোমেন এসে বসেছে সকলের মাঝখানে। সে বোম্বাইতে এখন ভাল চাকরি করে। কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ একেবারেই কম। নরেশচন্দ্রের আমলে পুরনো ভিটে যেটুকু ছিল, বৃদ্ধা পিসির মৃত্যুর পর সেটি বিক্রি হয়ে গেছে।

মিলি গিয়ে বসল পিছন দিকে। সোমেন তার প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে চাকরি বাকরির আলোচনায় মন দিল। মামা মামী ভাই ভগ্নীর দল এবং অভ্যাগতরা সোমেনকে যখন ঘিরে বসে উৎসুক হয়ে চায়ের আসর জমিয়ে তুলল, সেই সময় সুরমা দেবী ভিন্ন একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সুরমা যে এতক্ষণের মধ্যে এসে সোমেনকে অভ্যর্থনা করেননি, এবং তিনি যে পরিচ্ছদ বদল করার জন্য ঘরে গিয়েছিলেন, এটি আমিও বুঝতে পারিনি। বিস্ময়ের কথা এই, সোমেনও এসেছে নিমন্ত্রিতের চেহারায়,--যেমন এসেছে বাইরের অভ্যাগতরা,—এবং সেও তার জননীর অনুপস্থিতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি।

সুরমা এগিয়ে আসতেই আমি বললুম, সোমেন, মায়ের দিকে বুঝি এখনো চোখ পড়েনি? তোরা আজকাল কি হলি বল্‌ত?

সোমেন বোধ হয় তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জননীর পায়ের ধুলো নেবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু সকলের সামনে সেটি বেমানান হতে পারে, এই মনে করে সে থমকিয়ে গেল। শুধু চেয়ার ছেড়ে উঠে

এসে হাসিমুখে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনার শরীর ভাল আছে ত ?

হাসিমুখে সুরমা দেবী বললেন, হ্যাঁ, ভাল। এ বাড়ি চিনে বার করতে তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি ?

না, এমন কিছু নয়।

সোমেন থমকিয়ে গিয়েছিল কেন আমি অনুমান করতে পারি। সুরমা দেবীর পরনে ছিল অতি মিহি সরু কালপাড় ধুতি, ধুতিখানা উত্তমরূপে কোঁচানো, মাথার কুঁচি দেওয়া চুলে ক্লিপ্ আঁটা, বাঁ হাতে শাদা ফিতে বাঁধা একটি মূল্যবান হাতঘড়ি, পায়ে সাচ্চাজরির কাজ করা ধবধবে শাদা কটকি চটি। দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, সুরমা দেবীর পোশাকসজ্জাটা সন্তানের চোখে একটু বিসদৃশই লাগে। কিন্তু এ আলোচনা আমার অধিকারের বাইরে। নরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই প্রথম সোমেন্দ্রকে কাছে পাওয়া গেছে। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, সোমেন্দ্র আজও তার মায়ের কাছে সন্তান হয়ে ওঠেনি, এবং সুরমার আচরণের ভিতরে একথা স্পষ্ট—সন্তানকে কাছে টেনে নেবার মতো তাঁর সাহসেরও একান্ত অভাব। ওপাশে বসে সতীশচন্দ্র, রবীন্দ্র, ছেলেমেয়ে বৌ-ঝিরা সবাই দেখতে পাচ্ছে সোমেন্দ্র তাদের আত্মীয় বা স্বজন কেউই নয়, সে দূরের এবং অপরিচয়ের, তার সঙ্গে না আছে কারও মনের যোগ, না নাড়ির টান। এপাশে বন্ধুস্থানীয় যারা,—মিলির বন্ধু বাসনা চৌধুরী, ডলি রায়, কল্যাণ ও রমি দত্ত,—এরা সবাই এসেছিল যে-উৎসাহ নিয়ে, সেটি স্তিমিত হতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। মিলির দিকে অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে আমি যখন একটু বিব্রতভাবেই বসেছিলুম, তখন সুরমা আমার পাশে এসে বসলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বললেন, কথাটা তুমিই আরম্ভ কর না কেন ?

উভয় পক্ষের পারিবারিক গোলযোগের ব্যাপারটা জানে না,

এমন ব্যক্তি এখানে কেউ নেই। কিন্তু অপ্রিয় আলাপ উত্থাপন করার চেষ্টাটা বোধ করি সকলের রুচি ও শিক্ষায় বাধে। মিলির ব্যাপারটা কারও অবিদিত নয়। সোমেন্দ্রর বিবাহটা যে সুরমার সম্মতিতে ঘটেনি, এ সবাই জানে। শুধু শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সোমেন্দ্রর বর্তমান সম্পর্ক কি প্রকার,—এটি খুঁটিয়ে জানার জন্যে সকলেরই একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা আছে।

আমার ডাকে এক সময় সোমেন্দ্র মুখ ফিরাল। আমি প্রশ্ন করলুম, আমাকে বল্‌ত দেখি, নিজের দেশগাঁ ছেড়ে অত দূরে তুই আস্তানা বাঁধতে গেলি কেন? বোম্বাই ছাড়া কি আর কোথাও তোর কাজ জুটল না?

সোমেনের হাসিটি বড় মিষ্ট। সে সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, বোম্বাই আমারও তেমন ভাল লাগে না, তবু কাজের জন্য থাকতে হয়।

এবার ওপাশ থেকে হঠাৎ মিলি কথা বলে উঠল, এ চাকরি ত তুমি বেছেই নিয়েছ যাতে এখান থেকে সরে যেতে পার!

মামা সতীশচন্দ্র এবং অন্যান্য সকলে যখন মিলির দিকে মুখ ফিরালেন, সোমেন্দ্র তখন বলল, হ্যাঁ, মিথ্যে বলোনি। একলা ওখানে আমি ভালই থাকি।

আমি বললুম, এ কেমন কথা রে। এদিকে তোর ঘরসংসার পড়ে রইল, আমরা সবাই রয়েছি, তোর এই বয়স,—সবাইকে ছেড়ে তুই থাকবিই বা কেন? তোর মায়ের কথাটাও ভাববিনে?

সোমেন্দ্র একবার চায়ে চুমুক দিল। একটু সময় নিল। তারপর বলল, সব জেনেশুনেও এসব আলোচনা কেন তুলছ? আমি নিশ্চয় এখানে এসে কাঠগড়ায় উঠিনি! আমার সমস্যা নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করিনি।

সুরমা দেবী এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি তোমার মা,—

আমি যেখানে থাকি, সেইখানেই তোমার ঘর সংসার পাতা উচিত, সোমেন।

সোমেন তার জননীর দিকে পাশ ফিরে তাকাল, সে-চাহনি একটু অন্য রকমের। সেই চাহনি এইটিই পরীক্ষা করতে চাইল যে, সুরমা দেবী তার প্রকৃত স্নেহময়ী জননী কিনা। আমি স্পষ্ট দেখলুম আশৈশবের সংশয় এবং নিস্পৃহতা সোমেনের সেই দৃষ্টিতে মাখানো।

সোমেন একটু হাসল। পরে বলল, কথাটা ত ভালই!

সুরমা দেবী তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন, তা হলে তোমার আপত্তি কোথায় বাবা?

সোমেনের প্রসন্ন ও সুশ্রী মুখখানিতে এবার কাঠিন্য ফুটল। কিন্তু সে সংযত কণ্ঠে বলল, চায়ের আসরে এসব আলোচনা নাই উঠল। ক্ষমা করবেন, আমাকে এখনই যেতে হবে।

এর পর কোনও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এই আশঙ্কায় সতীশবাবু এবং রবিনবাবু সপরিবারে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের দেখাদেখি উঠে পড়ল অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরা। গরম গরম শিঙ্গাড়ার আকর্ষণেও বেশিক্ষণ আর থাকা গেল না।

মিথ্যে নয়, সোমেন সরে গেছে অনেক দূর। সে এবাড়িরই ছেলে, কিন্তু তাকে আর চিনতে পারা যাচ্ছে না। যদি কেউ তলিয়ে ভাবে, তাহলে দেখা যাবে এর পিছনের সুদূর ইতিহাসে রয়েছে পিতামাতার মনোমালিন্য। তাঁদের সকল প্রকার বিসংবাদের অন্তরালে ছেলেমেয়েদের প্রকৃতি ও চিন্তাধারা কোন্ পথে বাঁক নিচ্ছিল, এটি তাঁরা একটিবারও বিশ্লেষণ করে দেখেননি।

একে একে সবাই হাসিখুশী মুখে এক সময় বিদায় নিল। শুধু বাকি রইলুম আমরা চারজন, এবং মামার বাড়ির ছেলেমেয়ে তিনটি। তাদের সঙ্গে সোমেন্দ্রের যথেষ্ট পরিচয় নেই।

সুরমা দেবী বললেন, নিজের বাড়ি ছেড়ে তুমি হোটেলে থাকতে গেলে কেন, সোমেন ?

নিজের বাড়ি ! সোমেন হঠাৎ হাসল। বলল, আপনারা কিচ্ছু ভাববেন না, ওখানে আমি ভালই থাকি।

তুমি কি এর মধ্যে তোমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলে ?

সোমেন একবার সুরমা দেবীর দিকে তাকাল। তারপর ইংরেজি ভাষায় আমাকে বলল, এসব নারীজনোচিত কৌতূহলের জবাব দেবার জন্য আমি প্রস্তুত নই !

ইংরেজী ভাষা সুরমা দেবী বোঝেন না বটে, কিন্তু পুত্রের মনোভাবটিও তাঁর পক্ষে বুঝতে দেরি হল না। পিছন থেকে মিলি বলল, মাসিমা, ওসব কথা আপনি নাই তুললেন !

সুরমা দেবী বললেন, মিলি, আমি ছেলে মানুষ নই। তোমরা আমাকে অবুঝ মনে ক'রে আমার মুখে হাত চাপা দিও না। এসব আমার জানা দরকার।

সোমেন এবার একটু হাসল। বলল, আপনার কি কি জানা দরকার, তা হলে বলুন ?

সুরমা দেবী সোজা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমাকে মা বলে ডাকতেও চাওনা, সোমেন ?

সোমেন একবার আমার দিকে তাকাল। পরে বলল, শুনেছি আমার দু'বছর বয়স পর্যন্ত আপনি আমার মা ছিলেন ! তারপর থেকে আমার সামনে আপনি নেই আমি কেমন ক'রে জানব যে, আমার মা আছেন ? বাবাকে ছাড়া আমি অন্য কারোকে চিনিনে !

সুরমা বললেন, তুমি কি বড় হয়ে শোননি, তোমার বাবা আমার একেবারেই বাধ্য ছিলেন না ? আমার সুখদুঃখের বিষয়ে তিনি একেবারেই ভাবেননি ?

আমি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলুম। বললুম, এতকাল পরে এসব

আলোচনা না তোলাই ভাল। মা-বাপের সম্পর্ক নিয়ে ছেলেপুলেরা নাই বা মাথা ঘামাল! আমি বলি এসব থাক্,—বর্তমানের সমস্যার মিটমাট হোক।

সোমেন মাথা নীচু করে ছিল, এবার মুখ তুলল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, দুঃখে দারিদ্র্যে যিনি টলেননি, কারও বিরুদ্ধে কখনও যিনি নালিশ জানাননি, কোনও মান-অভিমান যাঁর ছিল না,—তাঁর ছেলে হয়ে আমি আজ হঠাৎ তাঁর সমালোচনা করব, এমন আশা করা অন্যায়। আমাকে ক্ষমা করবেন।

সুরমা বললেন, তুমি কি আমার কথাটা তাহলে একেবারেই আমল দিতে চাও না, সোমেন?

আমার আর কিছু বলবার নেই।—সোমেন জবাব দিল।

সুরমা পুনরায় আগের প্রশ্নটি তুললেন। বললেন, তোমার শ্বশুরবাড়ির কথাটা আমার মুখ দিয়ে তুমি শুনতে চাওনা কেন, সোমেন?

আমি আবার আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। মিলি পুনরায় কাঠ হয়ে সুরমার দিকে তাকাল। সোমেন এবার তেমনিই শান্ত কণ্ঠে বলল, আমি যেখানে বিয়ে করেছি, তাঁদের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক হয়নি। যাকে বিয়ে করেছি তাকে আপনি চোখেও দেখেননি। আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কোনও যোগাযোগও ছিল না। তবে আজ কেন সেদিককার কথা জানতে চাইছেন?

তুমি আমার ছেলে বলেই জানতে চাই, সোমেন।

সোমেন একটু হাসল। বলল, আমি হয়ত আপনার ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম, কিন্তু আপনি মা হয়ে ওঠবার আগেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। লোকে যদি আজ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে ওই তোমার মা,—তা হলে সেই মাকে মা বলে ডাকতে একটু সময় লাগে বৈকি। আচ্ছা, আজ আমি উঠি—

সুরমা দেবী একটু চঞ্চল হয়ে আগেকার প্রশ্নই আবার করলেন, তুমি তবে এ বাড়িকে নিজের বলতে চাও না ?

না, এ বাড়ি আপনার।

সুরমার চোখ দুটো বোধ হয় জ্বালা করছিল। তিনি বললেন, সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে যায় সোমেন, কিন্তু মা আর ছেলের সম্পর্ক কোনও দিন ঘোচে না,—এটি মনে রেখ।

সোমেন হাসিমুখে বলল, তা হবে, বইতে পড়েছি বটে।

বিদায় নেবার আগে সোমেন মিলির দিকে দু পা এগিয়ে গেল। বলল, কই, তুমি ত' আজ কথাই বললে না, মিলি।

মিলি মুখ তুলল। ততক্ষণে তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। সে বলল, এমন ক'রে তোমার চলে যাওয়া কি ভাল হচ্ছে ?

সোমেন এবার হেসে উঠল। বলল, বেশ যা হোক, খেয়ে দেয়ে খুশী হয়ে চলে যাচ্ছি, এও বুঝি তোমার পছন্দ নয় ? শুনলুম নাকি এ বছরেও তুমি এম-এ পরীক্ষা দেবে না ?

না, দেবো না।

কা'র ওপর রাগ করলে ?

মিলি জবাব দিল না দেখে সোমেন আবার হেসে উঠল। পরে বলল, আমি এখনও সপ্তাহখানেক আছি কলকাতায়। আশা করছি আরেকবার সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আচ্ছা চলি—

সুরমা দেবীর উদ্দেশে একটি ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে আমাকে ইশারায় ডেকে সোমেন হনহনিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল।

আমি উঠে তাকে অনুসরণ করতে যাব এমন সময় সুরমা দেবী বলে দিলেন, আমার ড্রাইভার আছে নীচে, তাকে বলো সোমেনকে পৌঁছে দেবে।

আচ্ছা—

বাগান পেরিয়ে এসে দেখি সোমেন আগে ভাগেই একখানা বেবিট্যাক্সিতে উঠে বসেছে। এখানা সে আগেই ধরে রেখেছিল। তাকে অবশ্য বললুম, তোমার মায়ের গাড়ি রয়েছে, ট্যাক্সিকে তুমি ছেড়ে দাও।

সোমেন হেসে বলল, না, ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো।—শোনো? এই বলে সে গাড়ির ভিতর থেকে একখানা হাত বাড়িয়ে আমার হাতখানা ধরল। বলল, তোমার একান্ত অনুরোধেই আজ আমি এসেছিলুম। যাঁকে তোমরা মা বলতে বলছ, তাঁকে এবার দেখলুম প্রায় ছয় বছর বাদে। মা বলতে যখন বাধল, তখন না দেখলেই খুশী হতুম। আমার মায়ের চেহারা এ নয়। তিনি থাকুন আমার কল্পনায়! আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

কিন্তু এ কি ভাল হল, সোমেন?

ভাল হল না জানি। কিন্তু দোষ কার বলতে পার? এককালের মা-বাবার মনোমালিন্যের ফলাফল অন্যকালের সন্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের জীবনে অভিশাপ আনতে চাও কেন? আমাদের তিনটে জীবন নষ্ট হচ্ছে কাদের অপরাধে? মিলির জীবন কে নষ্ট করতে চেয়েছে, জবাব দিতে পার? আমার বাবাকে আমার বিরুদ্ধে কা'রা সেদিন বেনামী নোংরা চিঠি দিয়েছিল, যার জন্য রাতারাতি বাবা আমার বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন?

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। সোমেন আমার হাত ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেল। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় মিলি আমার সঙ্গে রিজেণ্ট পার্ক থেকে ফিরছিল। পথে একটু ঘোলাটে অন্ধকার ছিল। মিলি বলল, তোমাকে এর প্রতিকার করতেই হবে আমি বলে রাখছি।

মুখ ফিরিয়ে বললুম, কেমন করে করব?

আগে আমার সব কথা শোনো। আজ তোমার কাছে কোনও

কথা লুকোবো না। তারপর তুমিই বলবে আমার দোষ কোথায়!

আমি ত বলিনি তোর কোনও দোষ আছে?

মিলি হঠাৎ ডুকরে উঠল,—তবে কেন সবাই মিলে আমার জীবনটাকে নালা-নর্দমায় ফেলে দিচ্ছ? আমি কি একদিন সোমেনকে সমস্ত বিপদ-আপদ দুঃখ-দুর্যোগ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি?

এবার আমি হাসলুম। বললুম, কাঁদিসনে পোড়ারমুখি, থাম্। তোর বি-এ কোর্সে সংস্কৃত নিয়েছিলি! সেই শ্লোকটা কি পড়িসনি,—ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ? ত্যাগের দ্বারাই ভোগ! যাকে মনে মনে কামনা করেছিলি, তাকে মোহপাশ থেকে মুক্তি দে। তবেই তোর আনন্দ!

আমার কথায় মেয়েটা কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করল না। শুধু চোখ মুছে আমার পাশে পাশে চলতে লাগল।

॥ ২ ॥

মিলি যে আমার কাছে এই নতুন কাঁদল তা নয়। বোধহয় একান্ত বেদনায় কাঁদবার জন্যও মনের মতো মানুষকে দরকার। মিলি হয়ত সেইজন্যেই খুশী হয়ে আমার কাছে এসে চোখের জল ফেলত।

মাঝে কবে যেন একদিন টালিগঞ্জের কোন্ নিরিবিলি এক পল্লী পার হতে গিয়ে সে হঠাৎ কান্না নিয়েছিল! আমি তাকে প্রশ্ন করলুম, এতদিন ধরে তুই হা-হুতাশ করছিস কেন বল্ত? ভালবাসা তোর কতদূর এগিয়েছিল?

মিলি আমার কথার জবাব দিল না। একটু পরে বলল, আমার আর কোথাও মুখ দেখাবার উপায় নেই তা তুমি জান?

বললুম, তুই বুঝি বলে বেড়িয়েছিলি সোমেনের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে?

মিলি ফোঁস ক'রে উঠল,—আমি কেন বলব? সমস্ত রটনা ত মাসিমাই রটিয়েছিলেন! তিনিই ত সোমেনের বাবাকে লোক সমাজে অপদস্থ করার জন্যে আমাকে পাঠাতেন সোমেনের কাছে! উনি স্থির করেছিলেন কায়স্থর মেয়ের সঙ্গে সোমেনের বিয়ে দিয়ে নরেশবাবুর জাত্যভিমান ঘোচাবেন। ওঁরা আমার জীবন নিয়ে খেলা করেছেন তা তুমি জান? আমি এর শোধ নেব!

রাগ করে বললুম, তুই কি সেদিন কচি খুকি ছিলি? তোর নিজের জ্ঞানগম্যি ছিল না?

কী যে বল তুমি তার ঠিক নেই—মিলি বলল, কচি খুকি নয়ত কি? এগারো বছর আমার বয়েস, সোমেনের বয়স তখন চোদ্দ উৎরে পনেরো। আমি তাকে লুকিয়ে ডেকে আনতুম আমাদের বাড়িতে,—বাবা ওকে খুব ভালবাসতেন –

মুখ খিঁচিয়ে বললুম, এখন বাবার নাম করছিস কেন? ছোঁড়াটার টুকটুকে চেহারাটা দেখে তোর নিজের মাথা ঘোরেনি? তখন বুঝি লোভে প'ড়ে শিবপূজো আরম্ভ করলি?

মিলি রাগ করে বলল, সব কথায় তোমার তামাশা আর ঠাট্টা। ওইজন্যে তোমাকে মনের কথা বলতে চাইনে।

থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, এর পরেও মনের কথা? আস্তে আস্তে ছেলেটাকে গিলে খেয়েছিলি, এই ত?

না, গিলতে পারিনি! উত্তেজিত হয়ে মিলি বলল, গলায় আটকে গেছে। এবার সেই গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের ওপর শোধ আমি তুলব।

মিলির গলা ধরে এল। আমি তার পিঠে হাত চাপড়ে বললুম, শোন, কাঁদিসনে মিলি। জীবনের পক্ষে ভালবাসাটাই সকলের বড় পরিচয় নয়। ভালবাসা যদি মার খায় তাহলে কেন ভাবিস সেইটিই সকলের বড় আঘাত। যদি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকিস তবে মাটির ওপর ভর দিয়েই উঠে দাঁড়া। কান পেতে শোন, জীবনের ডাক আরও আসে অনেক দিক থেকে!

মিলি সেদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অনেক।

মিলি যে সময়টায় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছে সেই সময় একদিন হঠাৎ আমার কানে এল, সোমেন আর ফিরবে না বোম্বাইতে। কলকাতায় সে যেমন-তেমন একটা কাজ খুঁজছে। এটি মিলির পক্ষে উৎসাহজনক সংবাদ কিনা জানিনে, কিন্তু এটির মধ্যে একটি ঝড়ের সূচনা ছিল।

সুরমা দেবী এই সূত্রেই একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। একটি ছোট চিঠি পাঠিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিলেন, আমার

এখানে প্রায় সারাদিনই তোমাকে দরকার। সেজন্য প্রস্তুত হয়ে এস। আমার এখানেই আহারাদি করো।

তিনি যে বিশেষ ব্যস্ত হয়েই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেটি তাঁর মুখে চোখেই প্রকাশ পেল যখন তাঁর ওখানে এসে পৌঁছলুম। দোতালার করিডর পেরিয়ে হল্-এর দিকে যাব এমন সময় তিনিই এগিয়ে এসে বললেন, শুনেছ, সোমেন আর বোম্বাই ফিরে যাবে না? তা হলে আমার কাছে সে অমন লুকোচুরির কথা বলল কেন?

বললুম, তোমার কাছে সে হয়ত সত্যি কথা বলতে চায় না?

তবে কি সে আমাকে লুকিয়ে কলকাতায় থাকতে চায়?

সম্ভব!

তা হলে আমারও একটা কর্তব্য আছে। আমি তার মা।

আমি সুরমা দেবীর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, এই চৈত্রমাসে সোমেনের বয়স পঁচিশ পূর্ণ হবে। কতটুকু তার বয়স, কতটুকুই বা তার জ্ঞান? আমি যদি মায়ের কাজ না করি, তাহলে সে দাঁড়ায় কোথায়? এ কাজে তুমি কিন্তু আমাকে বাধা দিয়ো না।

আমি বললুম, বিলক্ষণ, তোমার ছেলে তুমি বুঝবে। তার ভালমন্দ সুখ-দুঃখ তোমার হাতেই থাকা উচিত। তবে এই অনুরোধ, তুমি একটু ভেবে চিন্তে মায়ের কর্তব্য করতে যেয়ো।

তোমার এ ভয় কেন?

একালের মা-বাপ সম্বন্ধে আমার ভয় একটু বেশি। তাদের বিচার-বুদ্ধি একালের সন্তানদের কাজে যদি না লাগে তাহলে মা-বাপের রাগ করা উচিত নয়।

সুরমা দেবী আমার সামনেই বসলেন। বোধ হয় তিনি আমার কথায় একটু ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবেন। বললেন, এসব কথা আজ হঠাৎ তুমি তুলছ কেন?

হাসিমুখে বললুম, রাগ করো না সুরমা। তোমার চুলে পাক ধরেছে, আমার চুল পেকে ঝরতে আরম্ভ করেছে। এখন যদি কিছু ভুল করো, সে-ভুল শোধরাবার আর সময় পাবে না। সোমেনকে তুমি গর্ভে ধরেছ বটে, কিন্তু ছেলেটি তোমার নয়!

সুরমা বললেন, বেশ ত, ছেলে যাতে আমার হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব! তোমার সাহায্য পাব কিনা আগে শুনি।

পাবে বৈ কি—আমি বললুম, যেমন চিরদিন পেয়ে এসেছ। কিন্তু তোমার ছেলের মনে ক্ষত রয়েছে, সেটি সারতে সময় লাগবে। তোমার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সুরমা।

ঈষৎ বিবর্ণমুখে সুরমা বললেন, প্রায়শ্চিত্ত! তোমার কথা ঠিক আমি ধরতে পারছিনে। পাপ করলুম কোথায় যে প্রায়শ্চিত্ত?

হাসিমুখে আমি বললুম, পাপ নয়। কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা তুমি যেদিন আচ্ছন্ন ছিলে, সেদিন একটির পর একটি অপরাধ করেছ!

সুরমা আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবশ্যই বিবাদ-বিসংবাদ হয়, কেননা দুটো ধাতু দু'রকম। অনেক ক্ষেত্রে এ দুটো চট করে মেলে, অনেক ক্ষেত্রে চিরজীবনেও মেলে না। কিন্তু সন্তানের জ্ঞানোন্মেষের আগে সব বিবাদের শেষ হওয়া উচিত, —নৈলে ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের সর্বনাশ। তুমি ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়েছিলে স্বামীর ওপর অভিমান করে, এবং পরে সেই ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

সুরমা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামালুম। পুনরায় বললুম, চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেটি কী সাংঘাতিক দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে মানুষ হল তা তুমি দেখলে না। কিন্তু এই ছেলেটাকে লোভের আকর্ষণে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে তুমি আমার প্রতিবাদ সত্বেও মিলিকে মোতায়েন করেছিলে। এগারো বছরের

এই সুশ্রী মেয়েটার উঠন্তি স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে চোদ্দ বছরের স্বাস্থ্যবান ছেলের বুকেও কাঁপন ধরতে পারে, এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় আসেনি! আজ আগাগোড়া ব্যাপারটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে চেয়ে দেখ।

সুরমা চুপ করে সব শুনলেন। পরে বললেন, মিলিকে যদি তখন আমি না পাঠাতুম, সোমেনের পড়াশুনোর এই উন্নতি হতে পারত কি? আমি কি সোজাপথে ছেলেকে সব রকম সাহায্য দিতে পারতুম?

পারতে সুরমা, পারতে। -আমি বললুম, অন্য অনেক উপায় ছিল। কিন্তু তোমার সেদিনকার উদ্দেশ্যটা আমার কাছেও লুকিয়েছিলে। তুমি মেয়েটাকে লেলিয়ে দিয়ে তোমার ছেলেকে টেনে আনতে চাইলে,—এবং এমন ব্যবস্থা করবার চেষ্টা পেলে, যাতে ছেলেটা চিরদিন তোমার কাছে বাঁধা থাকে। কিন্তু তোমাকে নিঃশব্দে শাসন করে গেল নরেশবাবু। সমস্ত সমাজকে সাক্ষী রেখে সোমেনের বিয়ে দিয়ে গেল ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে। তার ফলে মিলির আট বছরের প্রণয়-সাধনা ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু তোমার তাসের ঘর এক ফুৎকারে উড়ে গেল! তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের ফলে আজ তিনটি নিরীহ নিরপরাধ জীবন বিপন্ন।

বোধ হয় আমার এই সুলভ বক্তৃতার মধ্যে কিছু আবেগের সঞ্চার হয়েছিল, সেজন্য চেয়ে দেখলুম সুরমার মুখে চোখে কিছু উগ্রতা কমে এসেছে। প্রতিবাদ জানাবার জোরটা যেন সহসা কমে গেছে। এক সময় মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, তোমাকে এক বিশেষ কাজের জন্য ডেকে এনেছি। আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

আমি বললুম, সুরমা, আমি কোনদিন তোমার অবাধ্য হইনি। আজও হব না। যেখানে তুমি যেতে বলবে সেখানেই যাব। কিন্তু

আমার একটি অনুরোধ শুনে রাখ। তোমার ছেলে রয়েছে কলকাতায়, এবং এখানেই সে থাকবে। সুতরাং তুমি পা ফেলবে সতর্ক হয়ে। তোমার ছেলের শিক্ষা, রুচি এবং আত্মসম্মানবোধ একটু প্রখর। তোমার কোনও আচরণ যেন তাকে আঘাত না করে। এবারে বল, কোথায় যেতে চাও।

সুরমা বললেন, তিন বছর হল সোমেন বিয়ে করেছে, কিন্তু মেয়েটিকে আমি আজও দেখিনি। বিয়ের পরে শ্বশুরঘর করেছে মাস কয়েক। কিন্তু—

লজ্জা পেয়ো না সুরমা, স্পষ্ট করেই জেনে রাখ নতুন বউকে নিয়ে তোমার ছেলে কোনও দিন এক বিছানায় শোয়নি- !

একথা তুমি কেমন করে বিশ্বাস করলে ? সুরমা প্রশ্ন করলেন।

আমাকে কোন প্রশ্ন করো না, সুরমা।—আমি জবাব দিলুম, শুধু জেনে রাখ প্রতিক্ষণে সোমেনের চোখের সামনে অশরীরি অশ্রুমুখী মিলি দাঁড়িয়ে ছিল ! বাইশ বছরের তরুণ বালকের কান্না দেখে নববিবাহিতা বধূ কেঁদে আকুল হয়েছে ! সেই বধূ নিতান্ত নাবালিকা নয়, অশিক্ষিত কিংবা গ্রাম্য নয়, মাস-ছয়েক নিঃশব্দে স্বামীর এই মর্মান্তিক অবস্থাটা দেখল। তারপর বাপের বাড়ি যাবার সময় শান্ত হাসিমুখে আমার হাতখানা ধরে বলে গেল, তুমি সবই দেখলে, সবই জানলে। আমার দুঃখ রইল এই, স্বামী নিজের হাতে যেমন আমার কপালে একদিন সিঁদুর দিয়েছিল, তেমনই নিজের হাতে সে মুছে নিতে পারল না !

সুরমা এবার প্রশ্ন করলেন, মেয়েটার নাম কি ?

বললুম, চারুলতা !— চারুলতা যখন গাড়িতে উঠছিল তখন আমি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, স্বামীকে কি তোর পছন্দ হয়নি ?

পছন্দ ! থমকিয়ে চারু দাঁড়াল। জ্বলজ্বল ক'রে উঠল তার মাথার সিঁদুর ! বলল, এ তুমি কী বলছ ? এমন স্বামী কজন মেয়ে

পায় বলত ? এমন মিষ্ট ব্যবহার, এমন ভদ্র, এমন সংযত, তার ওপর এত রূপ এত স্বাস্থ্য,—আমি যে লক্ষ যুগের তপস্যা করেছিলুম !

সুরমা নতমুখে চুপ করে রইলেন।

রবিনের মেয়ে, মানে সুরমার ভাইঝি অনিমা চলল আমাদের সঙ্গে। গাড়িতে আগেভাগে উঠে সে বলল, তোমাদের ঘোঁট পাকানো অভ্যেস। অত ছাইপাঁশ গণ্ডগোল আমি বুঝিনে। আমি আমার বৌদিদিকে দেখব।

হেসে বললুম, যদি তোর বৌদিদি তোকে না দেখতে চায় ?

তা হলে বুঝব সব তোমার দোষ ! তুমিই যত নষ্টের গোড়া !

বটে !—আমি বললুম, কোমর বেঁধে এবার আমার সঙ্গে ঝগড়া ! এমন জানলে আমি তোর বাপের বিয়ে দিতুম না !

সুরমার সঙ্গে অনিমাও আমার রাগ দেখে হেসে উঠল।

বসন্তকালের দুপুর। রৌদ্র ছিল প্রখর। কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে অল্প কয়েক মাইল পথ। পথের দুপাশে বসন্তের শুকনো পাতা ঝরেছে অনেক। বন বাগানের বর্ণাঢ্য শোভা চোখে পড়ছিল। আমাদের গাড়ি দ্রুতবেগে দক্ষিণ পথে ছুটে যাচ্ছিল। মোটরের পক্ষে পথ বেশি দূর নয়।

পশ্চিমের পথটা গিয়েছে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে। আমি বার তিনেক এসেছিলুম এ অঞ্চলে। সুতরাং পথঘাট আমার জানা ছিল। আন্দাজ মাইল চারেক এসে আমি গাড়ি থামাতে বললুম।

নিঃঝুম এক পল্লীগ্রামের আনুপূর্বিক বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নেই। সামনে আমবাগান, এখানে ওখানে বাঁশঝাড়, অদূরে একটি গোয়াল ঘরে তিন চারটি গরু বাঁধা, তার পাশে ধানের মরাই এবং সামনে একটি আটচালা। গ্রামের একটি কুকুর পড়ে রয়েছে এক

পাশে। এদেরই মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা একটি পথ অদূরবর্তী একটি পুরনো আমলের দোতলা বাড়ির দিকে চলে গেছে।

আমার পক্ষে অপরিচিত কিছু নেই।

আমরা তিনজনে সেদিকে অগ্রসর হতেই কুকুরটা ডেকে উঠল, কয়েকটা ছাগল ছুটল, একটা ছোট মেয়ে কা'কে যেন ডাকল, একজন চাষী-বৌ গলা বাড়িয়ে দেখল,—এবং তারপর দেখতে দেখতে একটা সোরগোল পড়ে গেল।

সুরমার পা দুখানা আড়ষ্ট হচ্ছিল আমি বুঝতে পারছিলুম। অনিমা অধীর আগ্রহে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। কিন্তু সে মিনিট খানেক মাত্র। তারপরেই একে একে বেরিয়ে এলেন বাড়ির কর্তা ও গৃহিণীর দল। আমাকে দেখেই তাঁরা সানন্দে হৈচৈ ক'রে উঠলেন। বড় বেহাই ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরলেন, ছোট বেহাই অনিমাকে কাছে টেনে নিলেন, বড় কর্তার মা এসে সুরমা দেবীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। অন্যান্য পুরনারীরাও কাছাকাছি ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চোখে যে অসীম কৌতূহল ছিল, তার ভাষাটি আমার অজানা নয়।

সুরমার পায়ে ছিল মখমল বসানো এক জোড়া সুন্দর চটি। পরনে তাঁর উৎকৃষ্ট তাঁতের কোঁচানো মিহি শাদা ধুতি। গায়ে একটি দামী গরদের জামা। বাঁ হাতে হাতঘড়ি। শাদা ধুতিখানা কুঁচি দিয়ে পরা, তবে সুরমা একখানি রেশমী চাদর জড়িয়ে এসেছিলেন। সুরমা দেবীর যৌবনকালের অসামান্য রূপলাবণ্যের চেহারা আমার মনে ছিল।

কিন্তু ব্রাহ্মণঘরের বিধবার এই সুসজ্জাটা গ্রামের দৃষ্টিতে যে এ যুগেও কিছু বেমানান, এটি সুরমা দেবীর পক্ষে ভাবা কঠিন ছিল। তিনি তাঁর পিতার একমাত্র আদরিণী কন্যা ছিলেন, এবং সেই ভাবেই তিনি মানুষ হন। পিতারা বোধ করি ভুলে যান্ আজকের আদুরে মেয়ে

কাল হবে অন্যের ঘরের বউ, পরশু হবে সন্তানের মা, তারপর দিন হবে শাশুড়ী। বিধবা হলেই যে ভোগরহিত হতে হবে একথা সুরমা দেবী বিশ্বাস করেন না। বিধবার সজ্জার মধ্যে দৈন্য ও দুঃখ প্রকাশ তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন। কুমারী এবং বিধবা—উভয়ের সাজসজ্জা সমানভাবে সুরুচিসম্পন্ন হলেই তিনি খুশী। সুরমার বাঁ হাতের সুন্দর আঙুলটিতে হীরের আংটিটি ঝলমল করছিল। গ্রামবাসিনীরা অনেকটা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। বলা বাহুল্য, আমি একটু কুণ্ঠাই বোধ করছিলুম।

পরস্পর কুশল বিনিময়ের পর পরিচয়াদি আরম্ভ হল। এটি আমি ভুলিনি, সোমেনকে না জানিয়ে আমরা তার শ্বশুরবাড়ি এসেছি। সে যখন জানবে, সুরমা এসেছিলেন, তখন তার মনোভাব কি প্রকার দাঁড়াবে আমি জানিনে। এখানে সকলেই মোটামুটি জানে, সুরমা দেবী এ বিবাহের বিরোধী ছিলেন। কেন ছিলেন সে-ইতিহাস কেউ জানে না। এ বিবাহ যে একেবারেই সার্থক হয়নি, এ বিশ্বাস এখানে বহাল আছে। বহুলোকের ধারণা, ছেলের বাপই এই ব্যর্থ বিবাহের জন্য দায়ি। ছেলের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বিবাহে অগ্রসর হওয়াই উচিত ছিল। সুতরা সুরমার সম্বন্ধে এখানে তেমন বিরূপতা নেই, বরং তাঁর দূরদর্শিতার প্রতি এখানে কিছু আস্থাই আছে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করলুম। সুরমার পায়ে যতক্ষণ জুতো ছিল কেউ পায়ের ধুলো নেয়নি। অন্দর মহলের একটি বড় ঘরে এসে তিনি যখন মেঝের আসরে বসলেন, তখন ছোটরা একে একে এসে তাঁকে প্রণাম করে গেল।

মেয়ে মহলের আলাপ আলোচনার ভিতরে চাপা বিষ যতই থাক্, বাহিরের চেহারাটা বেশ হাসিখুশী। সুতরাং মিনিট দশেকের মধ্যে একদিকে যেমন লক্ষ্য করলুম বেহাই ও বেয়ানরা যতটা গল্প-

গুজবে মেতে উঠেছেন, অন্যদিকে চারুলতা এখনও সামনে এসে উপস্থিত হয়নি। সুতরাং আমি যেন কেমন একটা নাটকীয় ঘাত-সংঘাতের প্রতীক্ষা ক'রে বসেছিলুম।

একটি অতি সুশ্রী তরুণীর দিকে মাঝে মাঝে সুরমার চোখ পড়ছিল। মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশ। মুখের শান্ত ভাব এবং দুটি বড় বড় চোখের স্থির চাহনি কেমন যেন একটি স্বভাব-সংযমের পরিচয় দেয়। আমি সুরমার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললুম, ও মেয়েটিকে তুমি এখনও চিনতে পারনি। ওটি হল ছোট বেহাইয়ের বড় মেয়ে, নাম পুষ্পলতা। এবার বুঝলে ও কে? তোমার বউমার বড় বোন।

সুরমা হাসি মুখে মেয়েটিকে সম্ভাষণ জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়, পুষ্পলতা?

কেষ্টনগরে।—পুষ্পলতা জবাব দিল, এবং ওই কথাটিতেই এমনভাবে সে থেমে গেল যে, সুরমার মুখে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এল না।

আমার উল্লেখ সত্ত্বেও চারুলতার কথাটা এখনও কেউ তুলছে না। সুতরাং আমাদের মনে কৌতূহল প্রায় যখন একপ্রকার ছাপিয়ে উঠেছে তখন ছোট বেহাই হরিমোহনবাবু ধীরে ধীরে বললেন, আমার বড় জামাইটি হঠাৎ মারা গিয়েছে এই বছর দুই আগে। পুষ্প আমার এখানেই থাকে। আমার ওই দুটিই মেয়ে।

একটি সমবেদনার হাওয়া যেন ঘুলিয়ে উঠল, সেটি যেন কিছু অস্বস্তিকর। পুষ্পলতা এবার আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুরমা তার দেহশ্রীর দিকে একবার তাকালেন, পরে বললেন, ছেলেমেয়ে হয়নি?

বেহাই শুধু জবাব দিলেন, না।

মেয়েটিকে তাহলে বসিয়ে রাখলেন?

বেহাই বললেন, না, একালে মেয়েদেরকে বসিয়ে রাখা যায় না।

ওরা দুই বোনে মিলে আমাদের ঠাকুর-বাড়ির ওদিকে একটি ইস্কুল বসিয়েছে। ওই নিয়েই থাকে।

সুরমা বললেন, তাই বুঝি বৌমাকে দেখছিনে?

ছোট বেয়ান জবাব দিলেন, হ্যাঁ, এখুনি আসবে।

সোমেন্দ্র সম্বন্ধে এখনও কোনও উল্লেখ নেই, এটি লক্ষ্য করবার বিষয়। কথাটা সকলের মধ্যেই চাপা। সুতরাং ভিতরে ভিতরে যতই ফেনিয়ে উঠুক, বাইরে তার প্রকাশ নেই। অণিমা ঠায়ে সেই থেকে বসে রয়েছে। বোধহয় সেইজন্যেই এবার তার দিকে চোখ পড়ল। এক সময়ে বড় বেহাইয়ের একটি নাতনী এসে হাসিমুখে তাকে তুলে নিয়ে গেল।

সুরমার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল।

আমি বললুম, বুঝলেন বেহাই, এটি দুঃখের কথা—পুত্রবধূ যদি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘর না করে।

বেহাই বললেন, বটেই ত, আমরাও সেজন্য দুঃখ বোধ করি।

সুরমা বললেন, আমি সেই কারণেই আজ এলুম। হয়ত কবে কোথাও অপ্রিয় ঘটনা কিছু ঘটে থাকবে, সে সব বাধা এখন আর নেই। তা ছাড়া বিয়ে যখন হয়েছে তখন উভয়পক্ষে সবই স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

বেহাই বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। এত যুক্তির কথা। যেখানে স্বামী সেখানেই মেয়েমানুষের ঘর।

সুরমা এতক্ষণ পরে সাহস পেলেন। বললেন, ওই আমার একটিমাত্র ছেলে, তারই বউ। বুঝতেই পারেন ছেলের ঘর শূন্য দেখলে মায়ের মনের অবস্থা কি হয়। আজ যখন সব মিটমাট হয়ে গেল, তখন আমি আমার বৌমাকে নিয়েই যাই।

বেয়ান বললেন, আপনার পুত্রবধূর আপনিই অভিভাবক। আপনি যদি নিয়ে যেতে চান্ আমাদের কোনও আপত্তি নেই!

বিজয়গর্বে সুরমা দেবী আমার দিকে তাকালেন। বলা বাহুল্য, আমি মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম। সুরমা তাঁর নতুন কৌশলের খেলা খেলতে চান্‌, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পুত্রবধূটিকে নিয়ে তিনি রিজেণ্ট পার্কের বাড়িতে এবার তুলবেন এবং মিলিকে সুকৌশলে সরাবেন। চারুলতাকে কাছে রেখে তিনি রংয়ের গোলামস্বরূপ ব্যবহার করবেন, এবং সমাজ কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে এবার তিনি সোমেনকে বশ্যতা স্বীকার করাবেন।

সুরমার এ-চক্রান্তে আমার আপত্তি নেই। ছেলে এবং তার বউকে নিয়ে চিরদিন তিনি ঘর করুন, এটি সকলেরই কাম্য। আমি ভাবছিলুম নিরপরাধ ও দরিদ্রা মিলির কথা। তার চোখের জল আমি ভুলতে পারিনে। সুরমা এবার নিরুপায় মিলির উপর খড়্গাঘাত করার জন্য উদ্যত হয়েছেন। আমি ভয় পাচ্ছিলুম।

সুরমার বিজয়গর্বিত মুখে যে-হাসিটুকু দেখা যাচ্ছে, সেটি পৈশাচিক বললেই ভাল হয়। কিন্তু আমি তা বলতে পারব না। সুরমার মুখের উপর আমি কিছু কিছু সমালোচনা করে থাকি বটে, কিন্তু আমার প্রকৃত মনের কথাটা তিনি জানলে তাঁর সঙ্গে এতদিনে আমার বিচ্ছেদ ঘটে যেত।

বেহাইদের অবস্থা বেশ ভাল। এঁরা এককালে ছিলেন মস্ত জমীদার। এখন বিভিন্ন নামে সেই জমীদারি একপ্রকার অক্ষুণ্ণই আছে। সবই প্রায় খাসের জমি, প্রজাবিলি নেই। ধানজমি আছে অনেক। সুন্দরবন থেকে চা'ল আসে। এখানে লিচুবাগান, ওখানে আমবাগান, সেখানে নেবু বাগান। বছরে দশ হাজার টাকার শুধু ফল-পাকড় বিক্রি হয়। বাড়ির ছেলেরা আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিচ্ছে। কলকাতার একটি সিনেমা হাউসের মালিক এঁরা। এঁদের বড় বড় বিলের মাছ কলকাতায় চালান যায়।

সুরমা দেবীর পক্ষে এ ধরণের পরিবারকে দেখা অভ্যাস নেই।

তিনি ধনবানের মেয়ে,- কিন্তু অভিজাত বংশের মেয়ে নন। তিনি এসেছেন রিজেন্ট পার্কের অট্টালিকা থেকে, এবং এই ধারণা নিয়েই এসেছেন যে, পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের যে রকম অবস্থাই হোক,—আসলে গ্রাম্যতার দ্বারাই তারা পরিবেষ্টিত। কলকাতার সমাজের কাছে তারা কতটুকু? তারা কি আজও একালের পালিশ-করা সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হতে পেরেছে?

তিনি তাঁর কট্‌কি চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে বেহাই ও বেয়ানদের সঙ্গে এই বিরাট যৌথ পরিবারের ভদ্রাসনের আশেপাশে প্রায় আধঘণ্টাকাল ঘোরাঘুরিরও পরে জানতে পারলেন, এদের সীমানা এখনও শেষ হয়নি। বারোয়ারীতলা, কাছারি মহল, চড়কতলা, গাজনের খামার, অতিথিশালা, নারকেল বাগানটা পেরিয়ে ইস্কুলের মাঠ—এ সব এখনও বাকি! এদেরই ভিতরে ভিতরে চারপাঁচখানা বসতবাটি, দিঘির ওদিকে শিব মন্দির, পুরনো গাড়ির আড্ডা, ধান শুকোবার জন্য শান বাঁধানো মাঠ। রিজেন্ট পার্কের অট্টালিকা যত বড়ই হোক, এদের তুলনায় সামান্য।

এমন সময় দেখা গেল দূর থেকে অনিমা আসছে হাসিখুশী মুখে এগিয়ে, এবং তার সঙ্গে যে-মেয়েটি আপন লজ্জা[illegible]ভূত লাবণ্যরাশি ঢেকেঢুকে পাশেপাশে আসছে, সে হল চারুলতা। সুরমা একটু থমকিয়ে দাঁড়ালেন। পুত্রবধূকে দেখলেন তিনি এই প্রথম! আমি দু'পা এগিয়ে মিষ্টমুখে সম্ভাষণ জানিয়ে বললুম, কন্বমুনির আশ্রমে এসে পড়ব, একথা কি ভেবেছিলুম?

চারুলতা তার মুক্তাদন্তে যে-রাঙ্গা হাসি হাসল, একদা মহাকবি কালিদাস এইতেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন! কিন্তু সেটি পলকমাত্র, তারপরেই চারু সহাস্যে তার শাশুড়ীর আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে বলল, আপনার জুতোর ধুলো নেবো, না পায়ের ধুলো নেবো?

অতি বিনীত মধুর মিষ্টভাষণ! কিন্তু ওরই মধ্যে আমি যেন

কামানের গর্জন শুনতে পেলুম। উপস্থিত সকলের মনের উপর কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগল। আমরা সবাই যেন একটু অপ্রস্তুত হলুম।

সুরমা দেবী তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় পায়ের জুতো জোড়া ছেড়ে বললেন, কলকাতার বাড়িতে জুতো পরা অভ্যাস কিনা--

শাশুড়ীকে এই প্রথম প্রণাম! গলায় আঁচল দিয়ে আভূমি নত হয়ে চারুলতা সুরমাকে প্রণাম করল, এবং তারপর একে একে সকলকে। কিন্তু ওই সময়টুকুর মধ্যেই আড়চোখে আমি সুরমা দেবীর মুখখানা দেখে নিলুম। সেই বিবর্ণ বিমর্ষ মুখে আর যাই থাক, রিজেন্ট পার্কের বিন্দুমাত্র আত্মাভিমান নেই!

সুরমা চোট সামলিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, বিয়ের পর আমাকে দেখার ইচ্ছে হয়নি তোমার?

কথাটায় এমন কিছু অর্থ নেই। কিন্তু পরস্পর অপরিচিত শাশুড়ী-বউ মুখোমুখি দাঁড়ালে একথার একটা তাৎপর্য পাওয়া যায়। চারুলতা হাসিমুখেই জবাব দিল, ইচ্ছে হয়েছিল, সুবিধে ছিল না।

নাটকীয় আড়ষ্টতা পাছে দেখা দেয় সেজন্য আমিই হঠাৎ হেসে উঠলুম। বললুম, হ্যাঁ, ওই আর কি! মানে, চারু বোধহয় বলতে চাইছে, সুবিধে যদি বা ছিল সম্ভব ছিল না।

চারুলতা বোধ করি একটু ভিন্ন ধরণের মেয়ে। তেমনি শান্ত এবং নম্র কণ্ঠেই বলল, সম্ভব ছিল, সুবিধে ছিল না।—আসুন, আমাদের ওদিকে নিয়ে যাই।

বাড়ির অন্যান্য মহিলাকে একটু এড়িয়ে এক ফাঁকে চারুলতা তার দিদিকে ডাকল, এবং দিদি এসে সাদরে অনিমাকে তার সঙ্গে গল্প করার জন্য ডেকে নিয়ে গেলেন।

উঠোনের পাশ দিয়ে দুর্গাদালান পেরিয়ে চারু আমাদের দুজনকে উপরতলায় নিয়ে গেল। আমি বললুম, এ বাড়ির আরম্ভ আর শেষ

কোন্‌দিকে—ঠাহর করা যায় না। এ বাড়িটায় লোকজন দেখছিনে যে?

হাসিমুখে চারু বলল, আমার বাবার কাণ্ডই এই। এ বাড়ি উনি চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। সন্ধ্যে দিতে গেলে চারজন লোক লাগে। আমি রাত্তিরে চলে যাই দিদির বাড়িটায়, ওখানেই শুই।

তোমার দিদির বাড়িও বুঝি আলাদা?

হ্যাঁ, ওই যে। খামারের ওপাশ থেকে আরম্ভ। দিদির বাড়িতে মোট তেত্রিশখানা ঘর আছে।—চারু বলল, আমার বাবা হলেন ছোট তরফের একটিই সন্তান। আমাদের ত' আর সহোদর ভাই নেই! বড় তরফের বাস্তুভিটে ভদ্রাসন পাশের গ্রামে!

তোমরা দুই বোনে এই বিপুল সম্পত্তি নিয়ে কি করবে?

চারু হাসল। বলল, আমরা এখানে কলেজ বসাব, তার কথা চলছে। আসুন—

দু'তিনটি বড় বড় হল্ পেরিয়ে চারু আমাদেরকে নিয়ে এল তার শয়নকক্ষে। কিন্তু হল্ পেরবার সময় দেখতে পাওয়া গেল পুরনো কালের সম্পদ ও আসবাব সজ্জা।

শয়নকক্ষে এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে ফস করে সুরমা ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে আমাকে বললেন, কই, তুমি এখানকার কথা আমাকে আগে বলনি ত?

হাসিমুখে আমি বললুম, তোমার ছেলের বিয়ে হয়েছে চার বছর। তুমি না দেখেছ বিয়ে, না দেখেছ পুত্রবধূকে। নিজের চারদিকেই তোমরা ঘুরছ। মেয়ের বাপের গল্প শোনার সময় ছিল কোথা?

ঘরময় মেহগনি আসবাব এবং শ্বেতপাথরের বিভিন্ন ও বিচিত্র সামগ্রী সুসজ্জিত। দেওয়ালগুলিতে রঙ্গীন কারুকার্যকরা। কয়েকখানি পুরাকালের তৈলচিত্র ঝুলছে,—তাতে রয়েছে হল্‌দিঘাটের

যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের তরবারী হস্তে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, রাজা রামমোহন এবং ঈশ্বরচন্দ্র!

একটু স্থির হয়ে ফরাসের উপর ব'সে সুরমা এবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি স্কুলে পড়াও?

মাঝে মাঝে পড়াই, তবে মহিলা-টিচাররা আছেন। আমি অন্য সব দেখাশুনা করি।—

সুরমার বোধ করি সন্দেহ হয়েছিল এ মেয়ে সোজা নয়। সেজন্য তিনি প্রথম থেকেই একটু জুড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে তিনি যে শাশুড়ি এই কথাই বা কেমন করে ভুলবেন! এক সময় ঈষৎ কাষ্ঠ-হাসি হেসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে ঠিক কি বলে ডাকব এখনও বুঝতে পারছিনে। নাম ধরে ডাকব, না বৌমা বলব?

বিলক্ষণ!—আমি এবার বললুম, তোমার একটিমাত্র ছেলে। কত আদরের, কত আনন্দের! নাম ধরে ডাকবে কেন তার বৌকে? বৌমা বলে ডাকবে! বৌমা শুনতে কত মিষ্টি!

চারুলতা আমার উচ্ছ্বাসের প্রতি একবার নির্বিকার শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বিনীতভাবে বলল, আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

আমি একটু আহত হলুম। বললুম, এ কি বলছ চারু? তুমি কি ওঁর বৌমা নও?

চারু জবাব দিল মিষ্টকণ্ঠে,—বৌমা হয়ে উঠিনি কোনদিন।

সুরমা এবার বললেন, তোমার অভিমান হতেই পারে, হওয়াই স্বাভাবিক। আমি তোমার সেই অভিমানই আজ মুছিয়ে দিতে এসেছি। আজ মনে প্রাণে তোমাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নিচ্ছি!

সুরমা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগের জিব-চেনটি টেনে একটি অতি মূল্যবান জড়োয়া নেকলেস বার ক'রে উঠে গিয়ে চারুর গলায় পরিয়ে

দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আনন্দে গদগদ হয়ে বললুম, আমি বুড়ো হয়েছি, কবে বলতে কবে পটল তুলব! কিন্তু যতদিন বাঁচব আজকের দিনটি মনে রাখব!

চারুর মুখের চেহারায় কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আমার ভাবাবেগটুকু থামবার পর সে আস্তে আস্তে উঠে এল, তারপর গলা থেকে নেকলেসটি খুলে সটান সুরমা দেবীর পায়ের উপর রেখে দিয়ে বলল, এটি আপনার পুত্রবধূকেই দেবেন, আমি এর যোগ্য নই!

আমার গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে উঠল, এবং সুরমার অপমানিত মুখখানার দিকে ভীতদৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি ভাঙ্গাগলায় বললুম, এ তুমি কি করলে, চারুলতা? উনি নিজে এসে তোমাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে মাথায় করে নিয়ে যেতে চান্, কিন্তু তুমি ওঁর সম্ভ্রম রাখতে পারলে না? তুমি সোমেন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী, ওঁর পুত্রবধূ,—এ কি মিথ্যে? এ নিশ্চয়ই একালের শিক্ষা নয়?

এতক্ষণে বুঝলুন চারুলতার নির্বিকার মুখখানির পিছনে কী সাংঘাতিক কাঠিন্য লুকানো। আমার কথায় তার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না। বরং পুনরায় সে একটু নম্র হাসি হাসল। বলল, ওটি আমার পাওনা নয়, আমাকে ক্ষমা করবেন। যাঁর পাওনা তাঁকে দিলে আমি খুশী হব!

কা'র কথা তুমি বলছ?

আমার বিয়ের দিন থেকে একটি দিনও যাঁর চোখের জল শুকোয়নি, সেই নিরপরাধ মেয়েটির কথাই বলছি। তিনিই আপনার পুত্রবধূ। তিনি তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন্ এই কামনা করি।

সুরমা চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, সেটি কায়স্থর মেয়ে, তা তুমি জান? তার সঙ্গে কখনই আমার ছেলের বিয়ে হতে পারে না, এটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

ভুলিনি!—মিষ্ট হাস্যের সঙ্গে চারু বলল, তবে এই আলোচনা আর নাই তুললেন। সবই ত আপনাদের জানা আছে!

তাহলে কি তুমি আর শ্বশুরবাড়ি যেতে চাওনা?

চারু বলল, আমার শ্বশুরও নেই, তাঁর বাড়িও নেই!

আমার ওখানে?

ওটা আপনার বাপের বাড়ি!

সুরমাদেবী আহত এবং অপমানিত মুখে কতক্ষণ চুপ করে রইলেন। অনেকটা যেন তিনি চোট খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়াতে তাঁর কতকটা সময় লাগল। কতক্ষণ পরে তিনি বললেন, আমরা দু'জনেই তোমার গুরুজন, তবু কথাটা না বলে থাকতে পারলুম না। দেশসুদ্ধ একথা সবাই জানে, আমার ছেলেকে নিয়ে ছ'মাস তুমি ঘর ক'রে এসেছ!

লজ্জা এবং সঙ্কোচের আভাসমাত্র চারুর মুখে চোখে দেখা গেলনা। সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে সে বলল, না, ঘর করিনি! সেই জন্যেই সিঁদুর মুছে ফিরে আসতে চেয়েছিলুম!

এসব কথা কি বলছ, চারুলতা? তুমি হিন্দুর মেয়ে, ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার জন্ম!—সুরমা দেবী তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

হাসিমুখে চারুলতা বলল, সেই ব্রাহ্মণেরই মান রাখতে চাই। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা আমি জেনেছি। সেই কারণেই বলছি, আপনাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখাই আমার পক্ষে সম্মানজনক। আপনার পুত্রবধূ আমি নয়,—মিলি! তাকেই আপনি গ্রহণ করুনগে। আমাকে ক্ষমা করুন।

এবার আমি কথা বললুম,—তবে যে শুনি সোমেনের সঙ্গে তোমার চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে? ঠিক সত্য বল ত?

আছে নয়, ছিল!—চারুলতা বলল, খান পাঁচ সাত চিঠি তিনি লিখেছিলেন ক্ষমা চেয়ে। সে চিঠিগুলো আমার মা'র কাছে আছে,

আপনারা দেখে যেতে পারেন। আমি শুধু খান দুই পোষ্টকার্ড জবাবস্বরূপ লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম! আপনার ছেলেটি খুবই সৎ-চরিত্র এবং সাধু,—আমি তার সুখ্যাতি করেছিলুম! সে যাই হোক, আমার এই অনুরোধ, আপনারা আর কোনওদিন আমার কোনও খোঁজ খবর নেবেন না! আমি নোংরা ঘাঁটতে পারব না।

নিষ্কাম শুধু নয়, সম্পূর্ণ উদাসীন। চারুলতার কণ্ঠে বিন্দুমাত্র রসকসের আভাস নেই এবং বিন্দুমাত্র ঘৃণাও নেই। দেখতে পাচ্ছি সোমেন সম্বন্ধে কোনও চেতনাই তার জাগেনি।

এরপর আর কোনও অছিলাতেই আমাদের বসে থাকা চলে না। পায়ের কাছ থেকে এক সময় নেকলেস ছড়াটা সুরমা তুলে নিতে বাধ্য হলেন। অতঃপর আমি বললুম, তাহলে অনিমাকে ডেকে দাও, চারু। বেলা প'ড়ে গেছে, আমরা এগোই। এ ভালই হল, উভয়-পক্ষের স্পষ্ট মনোভাবটি জানা গেল।

চারু উঠে পড়ল। বলল, চলুন, আপনাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

সমস্ত অট্টালিকা এবং উঠোন-বাগান পেরিয়ে যাবার সময় দেখা গেল, অপর কেউ আর এল না আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য। চারু শুধু এল আমাদের মোটর পর্যন্ত। কাছাকাছি এসে ভিতরে মুখ বাড়িয়ে এতক্ষণ পরে দেখলুম, আগে ভাগেই অনিমা গাড়িতে উঠেছে এবং বসে বসে চোখের জল মুছছে।

আমরা মৌখিক ও সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করে অতঃপর গাড়িতে উঠলুম।

চারুলতা সহাস্যে আমাদের বিদায় নমস্কার জানিয়ে পিছন ফিরে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

ঘটনাটা তলিয়ে এসে যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে সমস্ত ব্যাপারটা সহজবোধ্য। সুরমা দেবী তাঁর জীবনে এই অভিমতটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর স্বামী, পারিপার্শ্বিক সংসার ও সমাজ, তাঁর সন্তান,—এবং যে জগতে তিনি চলাফেরা করেন সেটি— এরা সবাই তাঁর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে। কিন্তু তিনি যে চোরা বালুর উপর ঘর বেঁধেছিলেন, এটি প্রথম থেকেই তাঁর চোখে পড়েনি। তাঁর স্বামী ছিলেন পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ; কিন্তু শ্বশুরের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে একজন মুন্সী হয়ে তিনি থাকতে চাননি এবং যুদ্ধের যুগে তাঁদের মধ্যবিত্ত ব্যবসায় যখন ধনশালী হয়ে উঠল,—তখন তিনি স্থায়িভাবে শ্বশুরবাড়ি বাস করতে রাজি হননি অথবা শ্বশুরের অর্থসাহায্যও গ্রহণ করেননি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মূল বিরোধের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। এর ফলে স্ত্রী বেছে নিলেন সম্ভোগের জীবন, স্বামী বেছে নিলেন দুর্ভোগের পথ।

সেদিন ফিরবার পথে সুরমা দেবীর চোখেও জল দেখেছিলুম। অনিমা তাঁর পাশে বসে চোখ মুছতে মুছতে এক সময় ফস করে চেঁচিয়ে যখন বলল, আমি বেশ জানি, সব তোমার দোষ!—তখন সুরমা দেবী এই ছেলেমানুষ মেয়েটির কথার প্রতিবাদ করবার জোর পেলেন না।

সুরমার চোখের জলের মধ্যে অপমানের এবং পরাজয়ের গ্লানি ছিল স্পষ্ট। এ কালের মেয়েদের মন শুধু অলঙ্কার দেখে যে বিভ্রান্ত হয় না, এটি তিনি আগে বুঝতে পারেননি। আধুনিক কালের অবস্থার চাপে পুত্রবধূরা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের জন্য প্রবল সংগ্রাম ঘোষণা করেছে, এ খবরটি তাঁর কানে

পৌঁছয়নি। যে-মিলিকে তিনি তাঁর দুষ্ট চক্রান্ত-জাল বিস্তারের কাজে বহুদিন অবধি উপকরণস্বরূপ ব্যবহার করে এসেছেন, সেই দুঃস্থ ও দরিদ্রের কন্যা শ্রীমতী মিলিও এবার তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আমি সেদিন মনে মনে চারুলতাকে সাধুবাদ দিয়েছিলুম। সে মেয়ে বুদ্ধিমতী, সেইজন্য আমার সঙ্গে তার যে একটি মধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান,--সুরমা দেবীর উপস্থিতিতে এটি সে প্রকাশ করেনি। নেকলেসটি সে সুরমার মুখের উপর ফেরৎ দিয়েছে, এতে আমি দুঃখিত হইনি। শুধু তাই নয়, সোমেন্দ্রকে সে যে মিলিরই স্বামী মনে করে, এতেও আমার অনেকটা সমর্থন আছে।

সোমেন্দ্রর বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ ছিল। সোমেন্দ্র সেটি জানত। সম্ভবত নিজের সম্বন্ধে একটি কৈফিয়ৎ দেবার জন্যই সেদিন দুপুর রোদে হঠাৎ সে আমার এখানে এসে হাজির হল। তাকে দেখে একটু বিস্মিতই হলুম।

কি রে, বোম্বাই ফিরে গেলিনে যে ?

রুমালে মুখখানা মুছে সে চৌকির উপর বসল। তারপর বলল, ফিরে যাবার জন্য আমি আসিনি। এখানে তুমি আমাব একটা যেমন-তেমন চাকরি জুটিয়ে দাও।

বললুম, অমন ভাল মাইনের চাকরি ছেড়ে দিলি ? চালাবি কি করে ?

ঘরের কোণে ছিল জলের কলসী, সোমেন উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে আবার এসে বসল।

আমি বললুম, হোটেলে এতদিন রয়েছিস, বিল্ শোধ করেছিস্ ?

কিছু বাকি আছে,—মিলি দিয়ে দেবে !

ছোঁড়াটার মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলুম। পরে বললুম, গরীবের মেয়ে সামান্য উপার্জন করে, তার টাকা নিচ্ছিস কোন্ মুখে ?

তা ছাড়া আরেক কথা। মিলির সঙ্গে তোর মেলামেশাটা অত্যন্ত অশোভন এবং নীতিবিগর্হিত, তা জানিস ?

সোমেন নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

এই যদি তোর মনে ছিল বিয়ে করতে গেলি কি জন্যে ? তখন কি নাবালক ছিলি ?

সোমেন বলল, তুমি সব জেনে শুনেও আজ এসব কথা কেন বলছ ?

আমি বললুম, বাপের মনে পাছে আঘাত লাগে এজন্যে তাঁর বাধ্য হতে গিয়ে তুই দু'-দুটো নিরপরাধ মেয়ের জীবন নষ্ট করতে বসলি ? অপবাদের ঘায়ে বাপও যে তোর বুক ফেটে মরে গেল রে ? তবে কী ছাই লেখাপড়া শিখলি তুই ? সবাই তোকে কেন বলছে, ভাল ছেলে ?

সোমেন প্রশ্ন করল, আমি সেদিন কী বলতে পারতুম ?

পালাতে পারতিস ! গলায় দড়ি দিতে পারতিস ! মিলির হাত ধরে বাপের পায়ের কাছে গিয়ে মাথা খুঁড়তে পারতিস ! তোর বাপ অবুঝ ছিল না !

সোমেন বলল, তিনি খোঁজ পেয়েছিলেন মিলি ও-পক্ষের গোয়েন্দা,—মিলি আমাকে কৌশলে মায়ের কাছে টেনে নিয়ে যেতে চায় ! মিলি যে প্রকৃত সাধু হতে পারে, এ তিনি বিশ্বাস করেননি। আমিও তাঁকে মিলির কথা বলতে সাহস পাইনি।

বললুম, সুরমা যে এখন আর মিলিকে সহ্য করতে পারছেন না, এ কি তুই জানিস ?

জানি।—সোমেন বলল, মিলিকে নিয়ে তাঁর ছিনিমিনি খেলা হয়ে গেছে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। পরে বললুম, যার সঙ্গে তুই মালাবদল করেছিস; কাঁদতে কাঁদতে শুভদৃষ্টি করেছিস, কুশণ্ডিকায় সিঁদুর দিয়েছিস কপালে,—তার সম্বন্ধে ভেবেছিস কিছু ?

তার সম্বন্ধে আমি যেন কোনদিন কিছু না ভাবি—একথা সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে। আমিও ছুটি পেয়েছি।

আমি হাসলুম। বললুম, তুই লেখাপড়া শিখেছিস কম নয়, কিন্তু বিদ্যে হয়নি। এ যে হিন্দুর বিয়ে রে! জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, মৃত্যুতে মোছে না। ধরে নে তুই আর চারুলতা দুজনেই মারা গেছিস। লোকে তোদের মৃত্যু ভুলেছে। কিন্তু বিয়েটা ঠিক দাঁড়িয়ে রয়েছে! ধরো, তুমি পৃথিবীর বাইরে টপ্‌কে গিয়ে মহাকাশের মধ্যে কোথাও মিলিয়ে গেলে,--ব্যস, দক্ষিণ মেরুর কোথাও বসে তোমার স্ত্রী থান কাপড় প'রে একবেলা আলোচাল ফুটিয়ে খেতে লাগল, এবং মাসে দুটো করে নির্জলা উপবাস ধরল। কেন জান? এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে যদি তোমাকে জন্মে-জন্মে ফিরে পাওয়া যায়!

সোমেন কতক্ষণ কথা বলল না। তারপর এক সময় আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল, তুমি কি বলতে চাও বল না? এখন আমার কি করা উচিত?

তাইত, ভাবিয়ে তুললি তুই!—আমি বললুম, আচ্ছা, মিলির সঙ্গে তোর বাঁধনটা কোথায়, ঠিক ক'রে বলতো?

কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাবো? আমরা কেউ কারোকে প্রতারণা করিনি, মিথ্যে কথায় ভোলাইনি!—সোমেন বলল, তুমি ত' দেখেছ আট বছর ধরে মিলি আমার সমস্ত খরচপত্র জুগিয়েছে! আমার জামাকাপড়, বই-কাগজ, ইস্কুল-কলেজের মাইনে. আমার হাতখরচ, আমার বড়মানুষি,—কোনদিন সে কার্পণ্য করেনি! মিলিও জানত না এটাকা ঠিক কোত্থেকে আসছে! আমার বড় মামা তাঁদের ঝিয়ের হাত দিয়ে মিলির হাতে দিতেন, আমি সেই টাকা না নিলে মিলি কান্নাকাটি করত। সেই টাকার মূল উৎস কোথায়, আমি কি জানতুম? হোক না কেন আমার বয়স তখন চোদ্দ-

পনেরো—আমার দরিদ্র জীবনে মনে হত মিলির চেয়ে আপন আর আমার কেউ নেই। যেদিন তার সঙ্গে দেখা হত না, সেদিন পড়াশুনাও আমার ভাল লাগত না।

মাঝপথে সোমেন একবারটি থামল, তারপর বলল, তুমি বিশ্বাস কর, আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব সেদিন অতি নিবিড় ছিল বলেই দুজনে আমরা অমন ক'রে মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পেরেছিলুম। তুমি ত' জান, মিলি স্কুল ফাইনালে ফোর্থ হল,—আই-এতে সেভ্‌নথ্‌ হল, বি-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেল! মিলি খুব সাধারণ মেয়ে নয়!

প্রশ্ন করলুম, মিলিকে কি কখনো তুই স্ত্রী বলে মনে করেছিলি?

ওকে ছাড়া আর কারোকে স্ত্রী বলে মনে করিনি!

তোর মায়ের ষড়যন্ত্র যেদিন ফাঁস হল, সেদিন মিলিকে তুই কি চোখে দেখলি?

সোমেন বলল, সেদিন মিলির চোখের জলে প্রথম যেন আমি দেখলুম তার স্বভাব-সরলতা! সেদিন থেকে সে যেন আরও আমার কাছে এল।

তারপর?

বোধহয় বাবা এই সময়টায় কিছু সন্দেহ ক'রে থাকবেন।—সোমেন বলল, মিলি তখন ফোর্থ ইয়ারে। আমি তখন মিলিকে পড়াতুম। ছুটির দিনে সেদিন আমি বাড়ী ছিলুম না, মিলি সেদিন আমার মায়ের একখানা চিঠি নিয়ে আমার ওখানে গিয়েছিল—

কি ছিল চিঠিতে?

তাঁর রিজেণ্ট পার্কের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ! আমাকে তিনি চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করেছেন। বাবা সেই চিঠি মিলির হাত থেকে নেন্—

মিলি তাঁর হাতে দিল কেন?

বাবার প্রতি তার অতিশয় শ্রদ্ধা! তা ছাড়া তার এটি স্বভাব-সৌজন্য। মা চিঠি লিখেছেন ছেলেকে, এবং ছেলের বাবা সে-চিঠি

হাতে ক'রে নিচ্ছেন,—এটার মধ্যে অপ্রকাশ্য কিছু থাকতে পারে, মিলি ভাবেনি।

বললুম, তোমার এবম্বিধ নিষ্কলুষ প্রণয়-কাহিনীর সংবাদ কি তোমার পিতৃদেব আগে জানতেন?

সোমেন বলল, বাবা আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন! কিন্তু ওই চিঠিতে মা আমাকে কি লিখেছিলেন, আজও আমি জানিনে। বাবা ওই চিঠি প'ড়ে মিলিকে কি বললেন, তাও আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু সেদিন থেকে একমাসের জন্য মিলি নিরুদ্দেশ হল, এবং ওই একমাসের মধ্যেই বাবা আমার বিয়ে দিলেন!

এবার আমি একটু বক্রোক্তি করলুম,—পরবর্তী ছয়মাস কাল নববধূর সঙ্গে সহাবস্থান করেছিলে,—বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহল জাগ্রত হতে পারে। যদি একটু আলোকপাত করো সুখী হই।

সোমেন বলল, নিঃসঙ্কোচেই বলব। ফুলশয্যার রাত্রে আমি মেঝেতে শুয়েছিলুম, নববধূ ছিল পালঙ্কে। সেই পালঙ্ক মিলির টাকায় কেনা। ঘর অন্ধকার ক'রে সেই মেঝেতে শুয়ে আমি আমার ও মিলির আগাগোড়া কাহিনী বললুম। শেষ র... উঠে যাবার সময় নববধূ বলে গেল, আপনার কথায় আমি একটুও দুঃখ পাইনি। শুধু একটি অনুরোধ, আমাকে কোনদিন স্ত্রী বলে মনে করবেন না।

ঢোক গিলে আমি প্রশ্ন করলুম, তারপর? বাকি ছয়মাস?

সোমেন বলল, দ্বিরাগমন সেরে নববধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। বাবা ওকে ডেকে বললেন, বৌমা, মাস ছয়েক এখানে এখন থাক, তারপর আবার বাপের বাড়ি যেয়ো।

বৌমা রাজি হয়ে বলল, তাই হবে বাবা।

আমি সোমেনের মুখের রেখাগুলি নিরীক্ষণ করছিলুম। সে বলল, আর আমার বলবার কিছু নেই। সে-মেয়েকে তুমি ভাল করেই

জান। শুনেছি, দধীচি মুনির অস্থি থেকে একদা নাকি বজ্রদণ্ড তৈরি হয়েছিল। সেই বজ্রদণ্ড পড়ে রইল ওই মিলির পালঙ্কে ছয়মাস, আর আমি সেই ঘরের বুকচাপা অন্ধকারে মেঝের উপর প'ড়ে থাকতুম একখণ্ড পাথর। সেই নিষ্প্রাণ পাথর নড়েনি কোনদিন, আর সেই বজ্রদণ্ডে বিদ্যুতের চেতনা কোনদিন স্পর্শ করেনি! ছ'মাস পরে বাপের বাড়ি থেকে লোক আনিয়ে সে যেদিন চলে গেল, তুমি ত' উপস্থিত ছিলে সেদিন!

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

সোমেন আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি যতই রাগ করো, এ ব্যাপারে আমি তোমার কোনও উপদেশ নিতে আসিনি। আমি যা ভেবেছি, সে আমি করব।

বেশ ত' তাই করবি। তবে তোর ভাবনাটা একটু ভেঙ্গে বল্?

সোমেন বলল, মিলি আর আমি এমন জায়গায় চলে যাব, তোমরা কেউ জানবে না।

বললুম, এটা ভাবতে ভাল, কিন্তু দেখতে ভাল নয় তা জানিস্?

দেখছে কে?

ওরে বোকা, দেখছিস তুই নিজে। তোর নিজেরই এতে নৈতিক সমর্থন নেই, তাই ভয়ে কাপুরুষের মতন মিলিকে নিয়ে পালাতে চাস! গর্দভ, সত্যিকার ভালবাসা কখনও পালিয়ে বেড়ায় না। সে নিজের মধ্যেই জোর খুঁজে পায়, এবং সেই জোরেই সব বিরোধের মীমাংসা করে। পালিয়ে বেড়াবি, সে যে মস্ত অপমান। নোংরা বাসনায় যারা জরোজরো, তারাই মান খোয়ায়! তুই ওই নিরপরাধ মেয়েটাকে সেই অসম্ভ্রমের মধ্যে কেন ডুবিয়ে রাখবি? ওটা ভালবাসা নয়, সোমেন!

তুমি তবে কি করতে বল?

আমি কেন বলতে যাব? তোর সমস্যার তুই মীমাংসা কর!

তুমি কি চাও আমাদের চিরকালের বিচ্ছেদ?

সেটা হলে মন্দ হত না!—আমি বললুম, কেননা তোদের বিয়েও হয়নি এবং মেয়েটার ওপর দাগও পড়েনি। কিন্তু একটা বিষয় ঠিক জানি। চারুলতা অন্তরের সঙ্গে তোকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি মিলির সঙ্গে তোর মিলিত জীবনও কামনা করে। মেয়েটা বিশ্বাস করে, সে তোর স্ত্রী হয়ে ওঠেনি। সে-মুক্তি নিয়ে তোকে মুক্তি দিয়েছে! স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তার রুচি বড় উন্নত। সে বরং উপবাস করবে, কিন্তু উচ্ছিষ্ট খাবে না! তুই কি মিলিকে বিয়ে করতে চাস্?

নিশ্চয়!—সোমেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

বললুম, তাহলে আধুনিক কাল এই কথা বলে আইন অনুসারে চারুলতার সঙ্গে তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটান দরকার। কিন্তু সোমেন, বিচ্ছেদ অত সহজ নয়।

সোমেন মুখ তুলল। বলল, কেন?

তুই কি প্রমাণ করতে পারবি তোর ওই শুচিশুদ্ধা বিয়ে-করা স্ত্রী কদর্য এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে? তুই কি এমন ব্যক্তির নাম করতে পারবি যার সঙ্গে তোর স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত?

সোমেন এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার সুশ্রী মুখের উপর রক্তের ছোপ লাগল। বলল, না না, এসব জঘন্য কথা। এসব কথা মুখেও এনো না!

আমি হাসলুম। বললুম, মনে রাখিস্, মামলা একটি করতেই হবে। সেটি রীতিমতো মামলা।

সোমেন প্রশ্ন করল, যদি সে আর আমি দুজনে এক দরখাস্ত দিয়ে হাকিমকে বলি, আমরা চাইনে পরস্পরকে, আমরা কোনওদিন মিলতে পারব না, একত্র থাকব না,—আমাদের নৈতিক বুদ্ধিতে বাধে,—তাহলে? হাকিম শুনবে না?

আমি হাসলুম। বললুম, হাকিম যখন প্রশ্ন তুলবে একটির পর একটি, যখন এটি জানা যাবে তোরা সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, এবং উভয়পক্ষের চরিত্র সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, এবং তুমি একটি কায়স্থ কন্যার প্রতি আসক্ত হয়ে সতী ও সাধ্বী স্ত্রীকে কেবলমাত্র দুর্মতিক্রমে তালাক দিতে চাও, তখন হাকিমের মনোভাবটি কল্পনা করতে পার কি? একথা মনে রেখ, অত্যন্ত স্পষ্ট, স্থূল এবং বিশ্বাসযোগ্য কারণ ছাড়া হিন্দুস্ত্রীকে আইনত পরিত্যাগ করা যায় না!

বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ হল, এবং আমরা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে যখন মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালুম, দেখি শ্রীমতী মিলি দ্রুতপদে ভিতরে এসে ঢুকল।

সবিস্ময়ে আমি বললুম, এর মানে?

সোমেনের বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল না। মিলি শুধু উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল, এবং তিনটি ইংরেজি শব্দে যে-কথাটি বলল, দুটি বাঙ্গালা শব্দে তার ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায়, পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী!

চোখ পাকিয়ে আমি বললুম, আমার এ-বাড়ি কি দুটি সমাজদ্রোহী পলাতকের আড্ডা?

অনেকটা,—বলে মিলি তার কাঁধের ঝোলাটা নামাল, তারপর সোমেনকে বলল, খেয়ে এসেছ হোটেলে?

সোমেন বলল, না, হোটেলের একাউন্ট ক্লোজ্ করেছি!

সে কি, বেলা যে আড়াইটে বাজে? দাঁড়াও দেখি—। ঠাকুর ও ঠাকুর—? বলতে বলতে মিলি ভিতরে ছুটল।

আমি চিরকাল আইবুড়ো। আমি আমার এক পিসির দত্তকপুত্র ছিলুম। বুড়ি ছিল মস্ত সম্পত্তির মালিক। আমাকে ভয় দেখিয়ে বুড়ি বলত, যদি সময় মতন বিয়ে থা না করো, তবে আমার সব সম্পত্তি আমি দানছত্তরে দিয়ে যাব। বলা বাহুল্য, আমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বুড়ি কিছু সন্দেহ পোষণ করত।

আনন্দের কথা এই, কলকাতায় প্রতি বছর কলেরার মহামারী আসে বন্ধুর মতন। বুড়ির ডাঁটো চেহারাটা অত সহজে কাবু হবে এটি ভাবিনি। বুড়িকে যখন সত্যই যমে ধরবে বলে মনে হল, সেই সময় ডাক্তার, উকীল, সাক্ষী এবং আরও দুই চারজনকে ডাকলুম। স্থানীয় থানার প্রধান দারোগা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

আমি যখন কাঁদতে কাঁদতে কায়মনোবাক্যে বুড়ির মৃত্যু কামনা করছিলুম, বুড়ি সেই দৃশ্য দেখে খুশী হয়ে প্রত্যেক কাগজে টিপ সই দিল। উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষিস্বরূপ সই করলেন। তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছে আমি বাঁচলুম।

বুড়ির মৃত্যুর পর ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছিল! সেই থেকে ঠাকুর চাকর রেখে আমি কতকটা জমিদারি চালে জীবন কাটিয়ে আসছি। আমার বিলাস ছিল এই, আমার এ-বাড়ির মধ্যে ভাড়াটে ঢুকতে দিইনি। শুধু চোরবাগানের নতুন ফ্ল্যাট বাড়িখানা তৈরি করিয়ে মোটা টাকায় ভাড়া বসিয়েছি। আমার যৌবনকালে জীবন দেখে বেড়াবার কিছু সখ ছিল। ফলে, অনেকবার আমার নৌকা অকূলে ভেসে গিয়েছে, এবং অনেক দুঃখ-লাভের পর সখ মিটেছে। এখন একমাত্র সখ, পুরনো বইয়ের দোকানে বই কিনে বেড়ানো। পড়াশুনো নিয়েই আমার দিন কাটে। আমি সোমেনের মায়ের দূর সম্পর্কের এক দাদামশাই হই।

রান্নাঘরে ঢুকে মিনিট পনেরোর মধ্যেই মিলি ঠাকুর ও চাকরের সাহায্যে আমাদের তিনজনের আহারের আয়োজন করে নিল। মেয়েটা আমার এখানে এলেই একেবারে গিন্নি হয়ে বসে।

আমি আর সোমেন যখন স্নান সেরে এলুম, মিলি ততক্ষণে তার ভিজা চুল কোনও মতে মাথায় ফিরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে হৈ চৈ আরম্ভ করেছে। যখন খেতে বসলুম, তখন সাড়ে তিনটে বাজে।

প্রশ্ন করলুম, আজ তোর প্রাণে এত স্ফূর্তি কেন বল্‌ত?

সোমেন বোধ হয় জানত কারণটা। সেজন্য সে মাথা হেঁট করে খেতে লাগল। মিলি বলল, আজ আমার কাঁদবার কথা, কিন্তু আর আমি চোখের জল ফেলব না, বুড়োদাদু।

কেন, হয়েছে কি ? মেয়েমানুষ হয়ে কাঁদবিনে, এ কেমন কথা ?

মিলি বলল, মাসিমা আজ আবার আমাকে ডেকেছিলেন। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো, আমি ঝগড়া করতে যাইনি। তাঁর অজস্র অপমানের উত্তরে আমি প্রথমটা চুপ করেই ছিলুম।

সোমেন মুখ তুলে বলল, তুমি না গেলেই পারতে ?

না গেলে আমার বাবার কানে আরও বেশি নোংরা কথা উঠত! আমার দাদা আর বৌদিদির পক্ষে সব জায়গায় মুখ দেখানো ভার হয়েছে! এমন সব কথা উনি রটিয়েছেন যে, আমার ছোট বোনের বিয়ে হবে না তা জান ?

এবার বললুম, তুই যাবার ফলে কি এগুলোর মীমাংসা হল ?

মিলি বলল, না, কোনটারই মীমাংসা হয়নি। তবে একথাটা আজ জানা গেল, মাসিমার সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না!

ব্যাপারটা কি ?—প্রশ্ন করলুম।

উনি বলতে চান্ আমার জন্যেই উনি পুত্রবধূকে হারাতে বসেছেন! আমি যদি সোমেনকে মুক্তি দিই, আমি যদি সুইসাইড করি, কিংবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাই, কিংবা অন্য কোথাও বিয়ে ক'রে বসি,—তা হলে তাঁর সংসারটা রক্ষে হয়!

হেসে বললুম, সুরমা দেবী পাকা লোক, কথাটা মিথ্যে বলেননি! তুমি কি বলতে চাইলে ?

মিলি আমার তামাশায় যোগ দিল না। বলল, আমার লুকোবার কিছু নেই! আমি বললুম, এর মধ্যে যদি আমার অপরাধ থাকে, তার জন্যে আপনি দায়ি! আট বছর ধরে একটি মেয়েকে আপনি

ছেলেধরার কাজে লাগিয়েছেন! আপনি নিজের হাতে যখন-তখন আমাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেস-পাউডার মাখিয়ে নিজের ছেলের মন-ভোলাতে পাঠিয়েছেন! আপনার একমাত্র চেষ্টা ছিল যাতে আমরা একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসি! আজ সোমেনের বাবা মারা গেছেন, আপনার আক্রোশ মেটাবার মানুষ আর নেই, তাই আপনি আমাকে ঝেঁটিয়ে ফেলতে চান্। পুত্রবধূকে ঘরে এনে এবার লোকের মুখে হাত চাপা দিতে চান্। আমি আপনার খেয়াল-খুশির খেল্না নই। মনে রাখবেন, আমি ছিলুম তাই আপনার ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে! যদি ছেলে আর ছেলের বউকে ফিরিয়ে এনে ঘরকন্না করতে চান্ করুনগে! আপনার ওই রাঙ্গামুলো মেরুদণ্ডহীন ছেলেকে আর কোনও মেয়ে সহ্য করবে না!

সোমেন খেতে খেতে এবার একটু হাসল।

মিলির উত্তেজনা তখনও থামল না। বলতে লাগল, তুমিত জান বুড়োদাদু, বছরের পর বছর মাসিমা আমাকে আদর জানিয়ে সব জায়গায় বলে'বেড়িয়েছেন, আমি তাঁর পুত্রবধ্ হব! আজকে তা যখন হইনি, তার জন্যে কি আমাকে কলঙ্কিত করবে সবাই? বিশ্বাসঘাতকতা করল যারা তাদের কি কোনও অপরাধ নেই? আমাকে তোমরা দাঁড়াবার জায়গা দিচ্ছ কোথায়?

মিলির গলা ধরে এল। সেদিনকার মিলি! ভাগ্যের হাতে মার খেতে আরম্ভ করেছে বলেই মুখে ভাষা এসেছে।

এবার শান্তকণ্ঠে আমি সান্ত্বনা দিলুম। বললুম, ভাবিসনে, যদি চোট খেয়ে পড়ে গিয়ে থাকিস, নিজের জোরেই আবার উঠে দাঁড়াবি। নে, খেয়ে নে ভাই। সব নিয়েই জীবন। এই ছেলেটার ভালবাসায় যদি তুই আনন্দ পেয়ে থাকিস, তবে সেইটিই তোর ক্ষতিপূরণ।

মিলি কতক্ষণ চুপ ক'রে তার আহারাদি শেষ করল। এক সময়

সোমেন বলল, তোমাকে এই জন্যেই বলি, তুমি আর রিজেন্ট পার্কে কোনদিন যেয়ো না।

আমি কি যাই সাধে ?—মিলি বলল, তোমার মানসম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে যাই। আমি যখন ঘাঘরা পরতুম, তখন থেকেই আমার মা বাবা দাদা বৌদিদি, পাড়া প্রতিবেশী,—সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছে, ওই সোমেনের মা, উনি হলেন তোর শাশুড়ী! উনি আধুনিক মহিলা, বামুন-কায়েত উনি মানেন না, উনি হলেন ফ্যাশনেবল্, ওঁর অত বাছ-বিচার নেই!

বললুম, কিন্তু সোমেনের বিয়েটা উনি দেননি, মিলি!

সে আমি জানি, বুড়োদাদু। যে-চক্রান্তে প'ড়ে তোমার এই পিতৃভক্ত নাতির বিয়ে হয়েছে, তাও আমি জানি।—মিলি আবার উত্তেজিত হয়ে বলল, কিন্তু আমার মাথায় সিঁদুর ওঠেনি আর ঘটা ক'রে শাখ বাজেনি বলেই কি আমি স্বামীকে আজ হারাব ? তোমরা কি এর কোনও প্রতিকার জান না ?

গলা পরিষ্কার ক'রে সোমেন এবার বলল, আমাদের সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে মা-বাবার রেষারেষি! আমার সান্ত্বনা ছিল এই, বাবা ছিলেন গম্ভীর, শান্ত, সংযত। কোনদিন কোন ব্যাপারে আমি তাঁর অবাধ্য হইনি। আমার অজ্ঞাতে তিনি মেয়ের বাপকে কথা দিয়ে এসেছিলেন! আমার কিছু জানবার এবং কিছু ভাববার আগেই তিনি একদিন রাত্রে ফিরে এসে আমাকে বললেন, কাল সকালে তুমি কোথাও যেয়ো না, বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে তুমি যাবে। প্রশ্ন করলুম, কোথায় ? বাবা বললেন, আমার এক বন্ধুর ওখানে, মাইল দশেক দূরে এক গ্রামে। তাঁর একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। যাও, আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়গে! —সবচেয়ে বিপদের কথা, মিলি তখন আমার ত্রিসীমানায়ও নেই। মাসখানেক আগে অপমান করে বাবা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন।

তুমি ত জানতে বুড়োদাত্থ, সেদিন আমার প্রতিবাদের জোর ছিল না! সেদিনের কথা ভাবতে আজ আমার মাথা হেঁট হয়।

আহারাদি শেষ করে আমরা বড় ঘরখানায় এসে বসলুম! এটি বেশ ঠাণ্ডা ঘর। আরাম ক'রে বসে আমি বললুম, যা ঘটে গেছে তা ঘেঁটে আর লাভ নেই। এখন তোমাদের মনের কথাটা শুনি। কী করতে চাও তোমরা?

সোমেন বলল, নিশ্চয় দুজনে দুদিকে চলে যেতে চাইনে! তুমি এমন ব্যবস্থা কর যাতে আমাদের নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে যায়।

বললুম, তোমার মা তোমার বন্ধু কিনা আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং নির্বিঘ্নে কোনও কাজ হবে মনে করিনে। সে যাই হোক দেখি কি করতে পারি। আমাকে কয়েকদিন ভাবতে দাও। চারুলতার সঙ্গে এ নিয়ে আমার কিছু কথাবার্তা হওয়া দরকার।

সোমেন, বলল, তুমি কি বিশ্বাস কর, বুড়োদাত্থ, মিলি আমার স্ত্রী নয়?

কেমন করে বিশ্বাস করব?—আমি রাগ করলুম,—বিশ্বাসের জোর পাচ্ছি কোথায়? তোমার প্রণয়িনী কি গৃহিণী হয়ে উঠেছে? কে বিশ্বাস করবে তোমাদের আট বছরের ইতিহাস? যদি কাগজ-কলমে সই-সাবুদ ক'রে বিয়ে করতে, যদি কোথাও হঠাৎ পালিয়ে গিয়ে ছুঁড়ির কপালে সিঁদির তুলে দিতে, কিংবা একসঙ্গে ঘরকন্না করতে,—তাহলে জোর পেতুম! তোমরা ত অবাস্তব শূন্যে ভাসা!

মিলি বলল, বুড়োদাত্থ, তোমার কাছে কেঁদেছি অনেকদিন। তুমি আমাকে তামাশা করতেও ছাড়নি, নোংরা গালাগালিও করেছ অনেকবার। হয়ত আমার পক্ষে উচিত ছিল গলায় কলসী বেঁধে লেক্-এর জলে ডুবে মরা। কিন্তু মরিনি কেন জান? আমার মধ্যে কাঙ্গালিনী বসে নেই! আমার যেখানে নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার, সেখানে চারুলতার কানাকড়িও দাবি নেই! এ যদি

আজকালকার পথঘাটের চোখ-ঠারাঠারির ঠুন্‌কো ভালবাসা হতো, তবে কবেই আমি ল্যাজ গুটিয়ে পালাতুম! 'আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার কঠিন সত্যের জোরে। তোমাদের বিয়ে শুধু সাত পাকের বাঁধনে বাঁধা!' কিন্তু আমার বাঁধন সমস্ত জীবন দিয়ে,—আমার ভাল মন্দ জীবন মরণ ইহকাল পরকাল ওই বাঁধনেই বাঁধা।—বলতে বলতে মিলির চোখে জল এসে পড়ল।

॥ ৪ ॥

চারুলতাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম :

যে-মানুষ তোমাদের সকলের কল্যাণ ভিন্ন আর কিছু কামনা করে না, তার একটি দাবি আছে বৈকি। তোমাদের সকলের বিবেকবুদ্ধির দরবারে আমার এই প্রার্থনা পেশ করছি, তোমার এই জটিল সমস্যার অবিলম্বে একটি সমাধান কর। আমার পক্ষে মুশকিল এই, তোমরা সকলেই আমার একান্ত প্রিয়।

আমার এখানে তুমি একদিন আসবে এজন্য সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি একা তোমার মুখোমুখি বসে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চাই। তোমার সেদিনকার নিঃসঙ্কোচ আচরণে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

এই পত্রের উত্তরে তুমি যদি তোমার আসবার তারিখ ও ঠিক সময়টি আমাকে পূর্বাহ্লে জানাও তবে আমি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুত থাকতে পারি। ইতি—

চিঠি পাবামাত্র চারুলতা জবাব দিয়েছিল :

দাদু, তোমার পত্রের উত্তরে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। সেদিন পাছে সুরমা দেবী তোমাকে সন্দেহ করেন সেজন্য তোমাকে 'তুমি' বলে সম্ভাষণও করিনি, এবং ঘনিষ্ঠভাবে তোমার সঙ্গে আলাপ করারও চেষ্টা পাইনি। ভাবছিলুম আমিই আগে তোমাকে চিঠি দিয়ে একদিন আমার এখানে ডাকব। তুমি তার সময় দিলে না। এ ভালই হ'ল।

আগামী ১৮ তারিখ আন্দাজ বেলা দুটোর সময় আমি তোমার ওখানে পৌঁছবার চেষ্টা পাব।

তুমি আমার সঙ্গে একা আলাপ করতে চেয়েছ, এতে আমার সুবিধা এই, তোমার কথায় অন্যের প্রকৃত মনোভাবটি বুঝতে পারব। কিন্তু আমার দিক থেকে বলছি, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যদি তোমার-আমার কথাবার্তার সামনে উপস্থিত থাকে, তাতে আমার নিজের কোনও অসুবিধা নেই। তুমি আর একবার আমার প্রণাম গ্রহণ করো। ইতি—তোমার নাতনী চারুলতা।

নির্দিষ্ট দিনে বেলা বারোটার মধ্যে আমার চিঠি নিয়ে এক বন্ধুর গাড়ি গিয়ে চারুলতার ওখানে হাজির হয়েছিল। চারুলতা আমার এখানে এসে যখন পৌঁছল বেলা তখন দুটো বাজতে দেরি আছে।

আমি গিয়ে হাসিমুখে চারুকে অভ্যর্থনা করে মোটর থেকে নামিয়ে আনলুম। ওরই মধ্যে আমার চোখে পড়ল, গাড়ির মধ্যে রাশীকৃত ভোজ্য সামগ্রী। চারুলতা মধুর হাস্যে আমার পিঠের দিকে তার হাতখানা জড়িয়ে বলল, তুমি একটু ভোজন-রসিক আমার মনে ছিল, দাদু। ফলমূলের কথা ছেড়ে দাও,—এই গাওয়া ঘি আমাদের বাড়িতে তৈরি। কাঁচাগোল্লাও তাই। তুমি খেজুরগুড়ের পাটালি আর আমসত্ত্ব ভালবাস, আমি ভুলিনি। ওটা আমাদের পুকুরের মাছ। মর্তমানের কাঁদি দেখে ভয় পেয়ো না।

চারুলতা হাসতে লাগল। আমি বললুম, আমি বিশ্বাস করিনে তুই শুধু এসব আমার জন্যেই এনেছিস। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

চারুলতা গলগলিয়ে হেসে উঠল। তারপর আমার থুঁৎনিটে নেড়ে দিয়ে বলল, এত বুড়ো হলে তবু দুষ্টুমি বুদ্ধিটুকু যায়নি! তুমি যে রাক্ষস নয় তা আমি জানি; তুমি যে চিরদিন পাঁচজনকে দিয়ে খাও তাও আমি ভুলিনি। চলো ভেতরে।—সঙ্গে আমার ঝি এসেছে, ওই একে একে নামাবে।

এ মেয়ে সুরমা দেবীর পুত্রবধূ নয়, এ আমার নাতনী শ্রীমতী

চারু। এ নাতনী কোথা থেকে পেলুম, সে কথা ওঠে না। কিন্তু জীবনের পথ থেকে একে একে সবাইকে যেমন কুড়িয়ে পেয়েছি, তেমনি একেও আজ বছর চারেক আগে পাওয়া গেছে। এ মেয়ে সেই কুণ্ঠিত জড়িত ভাগ্যলাঞ্ছিত পাষাণ-প্রতিমা নয়; সেই আত্মাভিমানী, সংযতবাক, অতিভদ্রা এবং কঠিনচরিত্রা নয়,—এ মেয়ে আজ আমার সামনে এসেছে তার সমস্ত কুণ্ঠা ও সামাজিক সৌজন্যের আবরণ দূরে সরিয়ে দিয়ে।

চারুলতাকে দেখে আজ আমি বিস্মিত হলুম বটে, কিন্তু এই চারুলতাকেই আমি চেয়েছিলুম!

গুছিয়ে বসে একসময় বললুম, সুরমা দেবীকে তোমরা সেদিন প্রথম দেখলে, সেজন্য আমি একটু আড়ষ্টই ছিলুম। তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলতে মনে মনে আমার ভয় ছিল।

চারুলতা একটু হাসল। বলল, দাদু, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানে, সুরমা দেবী আমার শাশুড়ী! আমি তোমার কাছে তাঁর নিন্দে করতেও আসিনি। কিন্তু—

কিন্তু কি রে?

চারুলতা সলজ্জকণ্ঠে বলল, উনি অমন ক'রে সেদিন পাউডার মেখেছিলেন, নখে রং দিয়েছিলেন, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পায়ে জুতো, জামাপরার ধরণ,—সবাই ওঁকে দেখে আড়ষ্ট। বাবা আর বড়পিসিমা পালিয়ে গেলেন!

আমি খুব হাসছিলুম। বললুম, তোর কপাল মন্দ, চারু। এমন শাশুড়ীকে হাতছাড়া করতে চাস।

চারুলতার মুখখানা তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে এল। বলল, আমার কোনও লোভ নেই, দাদু।

কিন্তু উনি যে শাশুড়ী একি মিথ্যে?

না।—চারু বলল, কোনটাই মিথ্যে নয়! শাস্ত্রমতে বিয়ে,

কুশণ্ডিকায় সিঁদুর, নারায়ণ সাক্ষী, সাতপাক ঘোরা, মালা বদল, মিথ্যে কোন্‌টা? শুধু যাকে স্বামী বলে মনে করার কথা, সেই মিথ্যে!

আমি নতমুখে চুপ করে রইলুম।

চারুলতা বলল, আমাদের গ্রামের লোক বলাবলি করে, বিয়ের আগে যে মেয়ের মুখে কথা ফুটত না, সাত চড়ে যার রা ছিল না—সেই লাজুক ঘরকুনো মেয়ে এখন ইস্কুল মাষ্টার! দাদু, এ ভালই হল। চোট খেয়েছি বলেই ত' মুখে ভাষা এল! আজ আমি তোমার কাছে মন খুলতে এলুম, তুমিও নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে সব কথা বল। আগে শুনি, আমাকে ডেকেছ কেন?

হেসে বললুম, তোমার চাঁদ মুখখানি একবার দেখলে আবার দেখতে সাধ যায়, তাই ডেকেছি।

ওই নাও!—হেসে উঠল চারু,—তুমিও সেই পুরুষমানুষ! সব মিষ্টি কথা জমিয়ে রেখেছ মেয়েছেলেদের জন্যে, তাই প্রথম থেকেই কপট স্তুতিবাদ!

উচ্চকণ্ঠে আমি হেসে উঠলুম।

চারু বলল, আচ্ছা, তোমার কি জানতে সাধ যায় না, ছ'মাস ধরে যে-মেয়েটা সিঁথির সিঁদুর নিয়ে অন্ধকার ঘরের খাটখানায় একা কঠিন হয়ে পড়ে রইল,—তার মনে কিছু একটা ভাবনা ছিল? সে যে অপরিসীম ঘৃণায় প্রতি রাত্রে ছটফট করেছে! শাস্ত্র, ধর্ম, বিয়ে, স্বামী, সংসার,—কোন্‌টাকে সে ঘেন্না করেনি বলতে পার? সব বাদ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে কথা বল, দাদু!

আমি বললুম, কিন্তু চারু, এইটিই আশ্চর্য,—এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নিরপরাধ। এমন কি সুরমা দেবীর মতন মানুষও প্রত্যক্ষভাবে কারও ক্ষতি করতে চান নি! সোমেনের বিয়েতে তাঁর কোনও হাত ছিল না,—এটি তুমিও নিশ্চয় জানো।

চারু নীরব। আমি পুনরায় বললুম, পুত্রবধূকে অসম্মানের মধ্যে এনে ফেলবার জন্যও নরেশচন্দ্র তোমাকে ঘরে আনেননি। সোমেন তোমাকে প্রতারিত করেনি। আমি নিজে মিলি আর সোমেনের সম্পর্কটা আগে জানতুম না। বরং আমি আজ এইটিই বিশ্বাস করি, সুরমা দেবী যদি কোন মতে আগে জানতে পারতেন, তা হলে তোমার এই অভিশপ্ত বিয়ে হতে পারত না। এটা নিয়তির একটা দুষ্ট চক্রান্ত ছাড়া আর কি হতে পারে!

চারু বলল, তুমি এ সম্বন্ধে কি ভেবেছ দাদু?

চারুর কণ্ঠস্বরে কিছু মাত্র আবিলতা, ভাবাবেগ, আর্দ্রতা অথবা বেদনার আভাস—কোনটাই নেই। অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং অতিশয় স্পষ্টতা তার কথাবার্তায়। আমি বললুম, তোমাকে বাদ দিয়ে এ সমস্যা ভাবব, সে-দুর্বুদ্ধি আমার নেই, চারু। সুতরাং তুমিই আমাকে বল, এর মীমাংসা কি!

চারু হাসল। বলল, মীমাংসা এর নেই। মীমাংসা হল মৃত্যু! তা যখন আপাতত হচ্ছে না, তখন নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি করা!

সেটা কি প্রকার?—প্রশ্ন করলুম।

চারু একবার হঠাৎ দরজার দিকে তাকাল। তারপর চট ক'রে উঠে গিয়ে কা'কে যেন বলল, তুমি এখানে কাছকাছি নাই বা থাকলে, তিনুর মা? বাইরে যে-বাগানটা দেখছ, তার ওপাশে গিয়ে বসে একটু হাওয়া খাওগে যাও।

তিনুর মা বলল, তোমার যেতে কি দেরি হবে, ছোড়দি?

হবে বৈকি।—চারু বলল, তোমার যদি ক্ষিধে তেষ্টা পায় তাহলে ভেতর মহলে যাও, ঠাকুর আছে, ঝি-চাকর আছে! তাদের ঠিক সময়ে বলো,—ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। আমাদের এখানে ঘোরাফেরার দরকার নেই।

তিনুর মা এ তল্লাট ছেড়ে পালাল। চারু আবার ফিরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল! আমি হাসছিলুম।

চারু বলল, কি প্রকার নিষ্পত্তি আমি জানিনে। তোমরা পুরুষ, শাস্ত্রধর্ম পাঁজিপুঁথি তোমাদেরই তৈরি। কথায় কথায় তোমরা বিধান দাও। তোমরাই মেয়েমানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! তুমি যেটাকে বিয়ে বলছ, আমি দেখছি সেটা মস্ত ফাঁকি। এটা বিয়ে নয় দাদু, চাবুকের দাগ, বিনাদোষের শাস্তি, বিনা কারণে অপমান। চার বছর ধরে এই কথাটাই আমাকে পেয়ে রইল, এ যেন ঢাকঢোল পিটিয়ে পাঁচজনের সামনে কালীঘাটের হাঁড়িকাঠে বলিদান! এক্ষেত্রে সাধারণ মেয়ে মনের দুঃখে মরে, কিন্তু আমি মনের জোরেই বাঁচতে চাই। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও, দাদু। আমার শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া,—যা কিছু বাঁধন সব ঘুচিয়ে দাও! আমি এই হাস্যকর, অরুচিকর, অপমানজনক অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।

দপদপ করছিল চারুর দুটো চোখ। কাছে নেই কেউ। যদি থাকত, দেখতে পেত চোটখাওয়া সর্পিণীর ফণা। আমি মাথা হেঁট ক'রে এই রুদ্ধ আক্রোশের অগ্নিস্ফুরণ দেখতে পাচ্ছিলুম।

স্বামী আমি ভালই পেয়েছিলুম দাদু,—চারু এক সময় হেসে উঠল, একটু নির্বোধ, কিন্তু বড় ভদ্র। একটু গোবেচারী, কিন্তু এমন সংযত প্রকৃতির ছেলে চট করে দেখা যায় না। ছ'মাস ধরে আমি ওঁকে নিরীক্ষণ করেছিলুম! এমন মিষ্টভাষী কি বলব!

আমিও এবার হাসলুম। বললুম, এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনে, প্রকৃত দুর্ভাগা কে! তুমি না তোমার স্বামী!

বোধ হয় দুজনেই। হেসে জবাব দিল চারু। বলল, কিন্তু একথা এখন থাক্। আমি বলি, শোন দাদু। বিয়েটা নাকচ করা যায় না, তবে নিষ্ক্রিয় করা যায়। আমার মা বাবা এতটা তলিয়ে সব জানেন

না, আমিও বলিনি। যদি চিরকালের জন্যে এই বিয়েটা নিষ্ক্রিয় থাকে তবেই এর মীমাংসা।

কেমন করে?

চারু বলল, কেউ কোনদিন কারও খবর নেবো না। কে কোথায় রইল জানতে চাইব না। কেউ কারও পারিবারিক পরিচয় দেবো না। লোকে যেন এইটি ধরে নিতে পারে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল সে ব্যক্তি চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!

তোর মন খারাপ হবে না?

পাগল আর কি!—চারু হেসে উঠল, যার সঙ্গে কোন সম্পর্কই হল না, তার জন্য মন খারাপ?

কিন্তু ছ'মাসকাল এক ঘরে যে শুয়েছিলি দুজনে?

দুটো গুড়ের কলসী, দাদু! একটা ছিল খাটের ওপর, আর একটা মেঝেতে!

বললুম, রেঁধে খাওয়ালি যে? ছাড়া কাপড় কাচলি যে?

তোমার এক কথা!—চারু আবার হাসল,—আমার মধ্যে যে রাঁধুনী, সেই রাঁধল; যে চাকরানী, সে কাপড় কাচল! তবে হ্যাঁ, ফুলশয্যার দিন রাত্রে উনি সসম্ভ্রমে আমাকে 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করেছিলেন!

তারপর?

সেই দিন শুনলুম ওঁর মনের ইতিহাস!

বলল তোকে?

সাধু এবং ন্যায়নিষ্ঠ তাই উনি সেদিন অকপটে মিলির কাহিনী বললেন। সমস্ত রাত কেটে ভোর হয়ে গেল!

রাগ ক'রে আমি বললুম, ধিক্কার দিচ্ছি সোমেনকে। এই স্বামীর তুই সুখ্যাতি করছিলি? স্ত্রীর কাছে প্রণয়কাহিনী ফেঁদে বসতে তার

লজ্জা হল না? রুচি এবং আত্মসম্মানে বাধল না? ক্ষমা কর চারু, এ আমি মঞ্জুর করতে পারিনে!

আমার ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে কপটতা আছে কিনা হয়ত চারু সেটি পর্যবেক্ষণ করছিল। সে শান্ত চক্ষে চেয়েছিল আমার দিকে। এবার সংযত ও ধীর কণ্ঠে সে বলল, দাদু, বোধ হয় তুমি ন্যায়বিচার করছ না! স্ত্রীর কাছে সে সস্তা ও নির্লজ্জ প্রণয়কাহিনী ফেঁদে বসেনি! নতুন স্ত্রীর কাছে সে প্রথম দিনেই বলে দিচ্ছে তার পিতার স্বেচ্ছাচারের কথা! অত্যন্ত সচ্চরিত্র এবং সাধু বলেই সে তার জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছে। একটি এগারো বছরের মেয়ে তাকে কিশোর বয়স থেকে অন্নবস্ত্র যুগিয়েছে, অর্থসাহায্য এনে দিয়ে তার শিক্ষার পথ সুগম করেছে। মেয়েটির স্নেহের ছায়ায় দুঃখে দুর্যোগে সে সান্ত্বনা পেয়েছে, আশ্রয়লাভ করেছে, আশ্বস্ত হয়েছে। যে-মেয়ে তাকে মানুষ ক'রে তুলেছে, প্রতিপালন করেছে, জীবনের নানা দিকে নানা পথ খুলে দিয়েছে,—তাকে খুব সামান্য মেয়ে মনে করছ কেন, দাদু? দীর্ঘ আট বছর ধরে যে দুটি প্রাণী অমৃতের সাধনা করেছে সেটাকে তুমি সাধারণ প্রণয়কাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে চাও কেন? নতুন স্বামীর মুখে সমস্ত রাত জেগে আগাগোড়া যখন এই ইতিহাস শুনলুম,—কই, মনে অশ্রদ্ধা আসেনি ত? বরং যদি উনি চেপে যেতেন, এবং ভবিষ্যতে এই নিয়ে সমস্যা দাঁড়াত, তখন ওঁকে প্রতারক বলেই মনে করতুম। তোমাকে আগেই বলেছি, আজও বলছি, ন্যায়ত ধর্মত উনি মিলিরই স্বামী! তুমি যেমন করেই হোক, ওদের বিয়ে দিয়ে ঘরকন্না গুছিয়ে দাও। আমি একথাও দিয়ে যাচ্ছি, যদি আমার দ্বারায় কোনও সাহায্য হয় আমি তাও করতে প্রস্তুত রইলুম। দাদু, মনে কর না এ আমার মস্ত বড় স্বার্থত্যাগ, তা মোটেই নয়। আমার স্বার্থও সৃষ্টি হয়নি, সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি,—সুতরাং এই ত্যাগ আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

ধরা গলায় আমি বললুম, তোমার জীবন কেমন করে কাটবে ?

অবাক করলে তুমি!—চারুলতা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, কোন্ যুগে বাস করছ বলত ? আর কি সেদিন আছে যে, পুরুষের গলায় ঝুলতে না পারলে মুখ থুবড়ে পড়ব ? হাসালে তুমি! পুরুষ মানুষরা একদিন আমাদের ধমক দিয়ে শিখিয়েছিল, আমরা ছাড়া তাদের কেউ নেই। এবার আমরা তাদের ধমক দেবো সেই দিন আসছে! ভয় পেয়ো না, দাদু, আমার ইস্কুল, আমার কলেজ, আমার গ্রাম, আমার সমস্ত দেশ! আজ আমার মনে হচ্ছে, ভাগ্যদেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন, তিনি আমাকে মোহরহিত করলেন। বিয়ের ফাঁসে জড়িয়ে পড়েছিলুম, এবার আমার পথ সত্যিই সুগম হল! তুমি ওদের বিয়ে দিয়ে দাও, দাদু, আমার জন্যে একটুও ভেবো না।

কিন্তু তোমার শাশুড়ী সুরমা দেবী যে বাধা দেবেন ? তিনি ত এখন আর মিলিকে চান্ না, তোমাকে ঘরে তুলতে চান্।

চারুলতা একটু হাসল। সে-হাসির মধ্যে এমন একটি বৈরাগ্য প্রকাশ পেল যেটি সুরমার পক্ষে খুব সম্মানজনক মনে হয় না।

আমার পাচক কিছু আহারের আয়োজন করেছিল, সেটি আমি চারুকে বললুম। চারু সোৎসাহে বলল, বেশ ত দাদু, তুমি যা দেবে তাই আনন্দ করে খাব!

তবে আরেকটি অনুরোধ রাখ ? —আমি বললুম, যে-আনন্দ তুমি আজ দিলে সেই আনন্দের আসরে আর দুটি বন্ধুকে যদি ডেকে নিই, তুমি কি রাগ করবে ভাই ?

না না, রাগ করব কেন ? এত' আনন্দের কথা দাদু ?—চারু হাসল, বলল, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি তা'রা কে! ডাকো তাদের। এমন সুযোগ আমিই বা ছেড়ে যাই কেন ? ডাকো—!

আমি নিচের তলা থেকে ইলেক্‌ট্রিকের বোতাম টিপলুম। এক মিনিটের মধ্যেই সোমেন এবং মিলি উপর থেকে সটান নেমে এসে

একেবারে খাবার ঘরের সামনে দাঁড়াল। চারুলতাকে মিলি দেখল এই প্রথম। সোমেন মাঝখানে এসে দাঁড়াল প্রসন্নমুখে। পাচক তখন গরম গরম লুচি নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। হঠাৎ হেসে উঠে চারুলতা বলল, ঠাকুর, তুমি রাখ, আমি সবাইকে পরিবেষণ ক'রে খাওয়াব।

আমি বললুম, আমাকে ক্ষমা কর, চারু। ওদের দুজনকে আমি ওপরে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমার সামনে আসতে ওরা আড়ষ্ট হচ্ছিল!

আড়ষ্ট! কেন?—আবার হেসে উঠল চারু, তারপর দৌড়ে নিয়ে মিলিকে সে একেবারে দুই হাতে জাপটিয়ে ধরল। বলল, এতটুকু অশ্রদ্ধা আমার নেই, মিলিদি। কে বলে, আমি আপনাদের প্রতিপক্ষ? আপনাদের দুজনের মাঝখানে কোনওদিন আমি দাঁড়াতে আসব না, আমাকে বিশ্বাস করুন।

মিলির চোখ দুটো বোধ হয় ঝাপসা হয়ে আসছিল। নিজেকে সামলিয়ে সে এবার বলল, তুমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করো, ভাই। গত চার বছরে প্রতি ব্যক্তির মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনেছি। সেই সুখ্যাতির একটিও যে মিথ্যে নয়, আজ আবার বিশ্বাস করলুম।

চারুলতা স্বচ্ছ হাসি হেসে সোমেনের দিকে ফিরল। বলল, দাঁড়িয়ে কেন, সোমেন বাবু? লজ্জা পাবার কিচ্ছু নেই। আপনাদের দুজনকে এখানে পাব আশা করিনি! এ খুব ভাল হয়েছে। আমাদের সকলের সম্পর্ক আজ সহজ হোক।

প্রশ্ন করলুম, কেমন ক'রে হবে চারু?

খুব সহজ!—চারু হাস্যোৎসাহিত কণ্ঠে বলল, আমি যদি কোনওদিন কোমর বেঁধে সোমেনবাবুর ওপর দাবি জানাতে না আসি তাহলেই ল্যাঠা চুকে গেল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিলিদি, আমাকে কোনওদিন সে-ভূতে পাবে না!

সোমেন বরাবরই একটু মুখচোরা। সে এবার স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার শুধু সান্ত্বনা এই, আমি আপনাকে প্রতারণা করিনি।

ঘুরে দাঁড়াল চারুলতা। সোজা সোমেনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, ভদ্রসন্তান প্রতারণা কখনো করে না! আপনি করেছেন ছেলেমানুষী! শুভদৃষ্টির সময় চোখের জল না ফেলে বরং বরের আসর ছেড়ে যদি উঠে গা ঢাকা দিয়ে পালাতেন তবে মান রক্ষে হত। আপনার পিতৃভক্তি! তুটি নিরপরাধ মেয়ের জীবনকে ধ্বংস করার চেষ্টায় আপনার ওই আধপয়সার পিতৃভক্তি কাজে লেগেছিল বটে!

আপনাকে ত বলেছি বাবার অবাধ্য আমি হতে পারতুম না!

এক ঝলক অগ্নিশিখা চারুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, থাকগে, ওকথায় আর কাজ নেই। আর কিছু না করুন, বিয়ের আগের শেষ রাত্রে খিড়কি দরজা দিয়ে পালাতে পারতেন! নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতেন কিছুকাল! সেই অবস্থায় মিলিদিকে বিয়ে করতে পারতেন! ...নি শক্তিমান বলে সকলের কাছে সেদিন শ্রদ্ধালাভও করতেন!

চারু সকলের পাতে লুচি বেগুনভাজা নুন ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে যেতে লাগল হাসি-হাসি মুখে।

ঘরের বাতাসটা যেন বিত্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রয়েছে। এটাকে একটু হাল্‌কা করার দরকার। আমি বললুম, গরম গরম লুচির সুগন্ধটা কেমন লাগছে, মিলি? মনে রাখিস এ আমার শ্বশুরবাড়ির গাওয়া ঘি!

ঘরের মধ্যে হাসির ঝড় উঠল। দরজার আড়ালে আবার এসে একস্থানে দাঁড়িয়েছিল তিনুর মা, সেও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পালাল।

আমি বললুম, নয়ত কি! আমার এখানে এসে যে যার সব

পাওনাগণ্ডা বুঝে নিলে! আমার বরাতটা ভালই বলতে হবে। চারু পড়ল আমার ভাগে।

অমন যে গোমড়ামুখো সোমেন—সেও হেসে উঠল।

আমি বললুম, বিশ্বাস করলিনে বুঝি? আমার পিসি তার মরণকালে হাতীবাগান থেকে গণৎকার আনিয়ে আমার হাতখানা দেখিয়েছিল। হাত দেখে গণৎকার বলল, তোমার দত্তকপুত্রের হস্তরেখায় বিয়ের যোগ রয়েছে দেখছি! বুড়ি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেসা করল, বিয়েটা কবে হবে, বাবা? লোকটা বলল, এ ছেলের সাতষট্টি বছর বয়সে এক পরস্ত্রী এসে জুটবে—!

আবার হাসির অট্টরোল উঠল। চারুলতা হাসতে হাসতে বলল, দেখছেন মিলিদি, বুড়ো হলে কি হবে? সখ এখনও মরেনি!

একে একে সমস্ত পরিবেষণ করল চারু। মাছভাজা, মাছের কালিয়া, কাঁচাগোল্লা,—কোনটা বাদ গেল না। একসময় সে নিজে এসে বসল মিলির পাশে। তারপর সামান্য একটু মিষ্টি নিজের মুখে দিয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, মিলিদি—আমার আসা[illegible] আজ সার্থক হল। আপনাকে প্রথম দেখে খুব আনন্দ পেলুম। আজ চার বছর ধরে এই কথাটা মন থেকে ছাড়াতে পারিনি, আমি যেন আপনার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছি তুটো মন্তরের জোরে। আজ আমারও মন পরিষ্কার হল।

মিলি বলল, সোমেনকে কি তুমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না?

হাসল চারু। বলল, ক্ষমা যদি না করতুম তাহলে এখানে এসে চোখের জল ফেলে যেতুম। যদি তুঃখ পেতুম তাহলে হয়ত ক্ষমা করতে পারতুম না। কিন্তু আপনাকে সত্যিই বলছি, তিলমাত্র তুঃখ আমার নেই।

এবার আমি বললুম, তুমি সম্মতি দিলে তবেই ওদের বিয়ে হতে পারে, চারু।

শুধু সম্মতি নয়—চারুলতা বলল, আমি নিজের হাতে চিরকালের জন্য লেখাপড়াও করে দেবো। আমি দেখতে চাই মিলিদি, আপনার ভালবাসা সার্থক হয়েছে! আমি শুনেছি আপনি দুঃখ পেয়েছেন অনেক। অনেক লাঞ্ছনা, অপমান, কলঙ্ক আপনাকে সইতে হয়েছে। এবার থেকে আপনার চোখে আর যেন না জল গড়ায়।

মিলি এতক্ষণ পরে তার চোখের জল মুছল।

আহারাদি শেষ হবার পর চারুলতা এক সময় আমাকে বলল, দাদু, তিনটে জীবন কা'র অপরাধে নষ্ট হতে বসেছিল, ভেবে দেখেছ কি? আমাকে মুখরা বল সইব। কিন্তু এর মূলে রয়েছে সোমেন-বাবুর মা-বাবার মনোমালিন্য, এবং সেই মনোমালিন্যের মূলেও রয়েছে তোমার সুরমা দেবীর লোভ, জিদ এবং আদর্শনিষ্ঠ স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা! ভবিষ্যৎকালে সন্তানদের জীবনে এই ঝগড়ার কী সাংঘাতিক ফলাফল দাঁড়াতে পারে, সোমেনবাবুর মা-বাবা সেকথা একবারও ভাবেননি। তুমি গিয়ে আমাব নাম করে তাঁকে এ কথাগুলি বলে এসো, দাদু।

মিলি অবাক হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ লক্ষ্য করছিল। এপাশে সোমেন স্তব্ধ হয়ে তার বিবাহিত স্ত্রীর নতুন চেহারাটা দেখছিল।

আমি বললুম, চারু, তুমি যদি অনুমতি কর, ওদের বিয়েটা শীঘ্রই আমি দিয়ে দিই। তুমি এসে দাঁড়াবে ত?

না দাদু, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হবে।—চারু হাসিমুখে বলল, মেয়েমানুষ সন্তানকেও দান করে,—তুমি নিজে যেমন দত্তক! কিন্তু স্বামীদান করে না কোনও হিন্দু-মেয়ে! ওটা শাস্ত্রেও নেই। মিলিদি সোমেনবাবুকে গ্রহণ করছেন তাঁর নৈতিক অধিকারে, সাধনা ও সততার জোরে, দীর্ঘকালের একান্ত সম্পর্কের দাবিতে।

আর তুমি?—প্রশ্ন করলুম।

আমি?—চারু পুনরায় হাসল। বলল, দাদু, আমার দানের

অধিকার নেই, সেইজন্য ত্যাগ করছি। একে তুমি নির্বিকার ত্যাগ বলতে পার। এই ত্যাগের মধ্যে অনুশোচনাও নেই, মনোবেদনাও নেই। নিজের সম্পত্তি হারালে লোকে দুঃখ পায়, কিন্তু পরের সম্পত্তি চুরি করতে পারলুম না বলে হাস্যকর অভিমান করব না। চার বছর ধরে একথা আমার মধ্যে স্থির হয়ে আছে, দাদু। আমার এই অবিচলিত আদর্শের জন্য সোমেনবাবুর সংযত আচরণে, তাঁর ভদ্র ব্যবহারে, তাঁর স্বভাব সাধুতায়। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। তবে যাবার সময় হয়েছে। বিদায় নেবার আগে মিলি ও সোমেনের কাছে গিয়ে চারু দাঁড়াল। বলল, এর পর আপনারা কি করবেন না করবেন সে-খবর আর আমি রাখব না, কোনও যোগসূত্র থাকে এও আমি আর চাইব না। আপনারা ও আমি সম্পূর্ণ মুক্তি পেলুম।

বললুম, এ যে একেবারে কাটান্-ছেঁড়ান্, একি করলি, চারু?

এই ভাল দাদু, এতে উভয়পক্ষেরই সম্মান বাঁচবে।—চারু বলল, তবে হ্যাঁ, এই প্রতিশ্রুতি আমি দিয়ে যাচ্ছি, যদি কোনও দিন আপনারা দুঃখে দুর্যোগে অভাবে কিংবা অভাবনীয় কোনও বিপদে পড়েন তাহলে সেদিন আমাকে খবর পাঠাবেন। আমাকে দিয়ে যদি আপনাদের কিছু সাহায্য হয় আমি তার জন্য প্রস্তুত থাকব। আচ্ছা নমস্কার—

ছুঁড়িটা গাড়িতে ওঠবার আগে হঠাৎ এসে আঁচল দিয়ে আমার পোড়া চোখ দুটোর জল মুছিয়ে পায়ের ধূলো নিল। তারপর হাসিমুখে আমার গলা জড়িয়ে ব'লে গেল, মাঝে মাঝে তোমার কাছে এমনি ক'রে ডেকে এনো, দাদু। কলকাতার এই মরুভূমিতে এসে পড়লে তোমার কাছে তবু তেষ্টার জল পাব!

চারুলতার এবম্বিধ চেহারাটা আগে আমার জানা ছিল না। সত্য বলতে কি, আমার পক্ষে এটি নতুন অভিজ্ঞতা। মনে মনে এই

অনন্যাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছিলুম বটে কিন্তু বিদ্রোহিনীকে মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে কিছু সময় লেগেছিল।

পড়াশুনোর মধ্যে আমি ডুব দিয়েছিলুম। এর মধ্যে আর কোনও দিক থেকে কারও কোনও খোঁজখবর পাইনি। আমি চুপ করেই গেছি।

সেদিনের সেই নাটকীয় দৃশ্যের পর প্রায় তিন সপ্তাহ যখন কেটে গেছে, তখন একদিন একখানা বড় আকারের রেজেষ্টারী চিঠি হঠাৎ এসে হাজির হল। সই করে চিঠিখানা নিয়ে খুলে দেখি, একখানা পাটকরা দলিল। প্রথম কাগজখানার উপরে ছাপা চওড়া নন্-জুডিশিয়াল্ ষ্ট্যাম্প। প্রতি ডেমিতে শ্রীমতী চারুলতা মুক্তাক্ষরে দস্তখৎ করেছে। সাক্ষীর মধ্যে রয়েছেন চারুর বাবা, একজন উকীল, একজন নোটারি পাবলিক, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্থানীয় থানার অফিসার, এবং আরও দু'তিনজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। দলিল বাঙ্গলায় লেখা। ভাষাটা মামুলি। কিন্তু বক্তব্যটি নতুন ধরণের।

চারু লিখছে, যে-ব্যক্তির সঙ্গে একদা আমার বিবাহ ঘটেছিল, বিবাহের রাত্রির সেই লগ্ন থেকে অদ্যাবধি তার সঙ্গে আমার কায়িক, মানসিক, সামাজিক, আত্মিক—কোনও প্রকার যোগাযোগ হয়নি। ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তির সঙ্গে কখনও আমার যোগাযোগ ঘটবে এমনও মনে করি না। তিনি কোথায় আছেন, জীবিত আছেন কিনা—এ আমার অজ্ঞাত। আমার স্বামী নামক প্রচারিত সেই ব্যক্তি বিগত চার বছরের মধ্যে আমার কোনও খোঁজখবর করেনি, এবং আমিও তার দরকার মনে করিনি। এই অবস্থায় অনির্দিষ্টকাল অবধি তার জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্মানহানিকর ব'লে মনে করি। এই দলিলের সাহায্যে অদ্য তারিখে এইটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি, পূর্বোক্ত অস্বাভাবিক, অসঙ্গত, অন্যায় ও আত্মসম্মান বিরোধী বিবাহের দায়িত্ব থেকে আমি নিজেকে অব্যাহতি দান করছি।

অতঃপর কেহ কখনও কোথাও থেকে এসে যদি আমাকে স্ত্রী বলে' দাবী করে তবে সেই দাবি সম্পূর্ণ বাতিল এবং নামঞ্জুর হবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, খোশ মেজাজে, বহাল তবিয়তে, অন্যের বিনা অনুরোধে বা প্ররোচনায় এই দলিল সম্পাদন করে দিচ্ছি।

দিন দুই লাগল দলিলখানা হজম করতে। আমি আইন-কানুনের ব্যাপারে পারদর্শী নই, তবু এই দলিলটি পাঠ করে এই কথাই মনে হল, হিন্দু বিবাহ নাকচ করার ব্যাপারে এই ঘোষণাটি বিবিধ বিধানের ধারা যথাযথভাবে অনুসরণ ক'রে চলেনি। এই দলিল মামলা-মোকদ্দমায় টিঁকবে কিনা জানিনে, তবে এটির মধ্যে চারুলতার বক্তব্যটি চিরকালের জন্য সুস্পষ্ট হয়ে রইল। বলা বাহুল্য, চারু আমার মারফৎ এই দলিলটি সোমেন এবং মিলির কাছেই পাঠিয়েছে। এটি আমি তাদের হাতেই তুলে দিতে চাই। তারপর আমি ছুটি নেবো।

তিন সপ্তাহের মধ্যে সোমেন অথবা মিলির খোঁজ-খবর পাইনি। আমি আমার পাচকের হাতে চিঠি দিয়ে মিলির বাড়িতে খোঁজ নিতে পাঠালুম। মিলির মা নেই, বাবা আছেন। সেই ভদ্রলোক সম্প্রতি বৃদ্ধ বয়সে নানা ব্যাধিতে ভুগছেন। তিনি আজও সামাজিক কানা-কানির ফলে ছোট মেয়েটির বিবাহ দিতে পারেননি। বাড়িতে আছেন বড় ভাই, তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। মিলির জন্য বাড়িতে শান্তি নেই।

পাচক ফিরে এল, এবং তার কথায় এইটুকু শুধু জানতে পারলুম, মিলি তার বাবার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে দিন পনেরো আগে মালদহ কিংবা মানভূমে একটি চাকরি নিয়ে চলে গেছে। বাবা যেন তার জন্য না ভাবেন।

আমিও প্রায় এই প্রকার সন্দেহই করেছিলুম। মিলি অথবা সোমেন তিন সপ্তাহকাল অবধি আমার এখানে দেখা দেবে না, এটি

অস্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস, যেখানেই ওরা গিয়ে থাকুক, একজন আরেকজনের কাছ ছাড়া হয়নি।

কিন্তু ওইটেই ত বড় কথা নয়। এর অন্য দিকও আছে। ওদের সম্বন্ধে আমার যে উদ্বেগ রয়েছে সেটি অস্বাভাবিক নয়। ওরা আবেগপ্রবণ, অবিবাহিত, সুতরাং আমার দুশ্চিন্তা আছে বৈকি। আমি একটু অস্বস্তিবোধ করছিলুম।

আমার পক্ষে অসুবিধা এই, আমার মাথার চুল শাদা হয়েছে। আমার মনোগত অভিপ্রায়, সোমেন ও মিলির বিয়ে হোক। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে হিন্দু বিবাহটাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলব, তোরা বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধগে যা—এটা এখনও পেরে উঠছিনে! আমি যদি সম্পূর্ণ একশ বছর বাঁচি তাহলে হয়ত বিবাহ-বিপ্লব দেখে যেতে পারব।

এইসব কথা নিয়ে মনে মনে যখন তোলাপাড়া করছি সেই সময় একদিন হঠাৎ ঝকঝকে শাদা রংয়ের যে মোটর গাড়িখানা এসে আমার বাড়ির সামনে দাঁড়াল, সেখানা আমি উত্তমরূপেই চিনি। উর্দিপরা ড্রাইভার চট করে নেমে দরজা খুলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লেডি সুরমা দেবী হনহনিয়ে ভিতরে এসে ঢুকলেন।

সব দেখেশুনেও গম্ভীরভাবে সাড়া দিলুম, কে?

সুরমা এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। মুখখানা তাঁর মেঘের মতো। তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘরে হঠাৎ কার্পেট পাতলে কেন?

আমি বললুম, শোনো কথা। পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচরকম মেয়েছেলে এসে ঘরে নাচানাচি করে, তাদের পায়ের তলায় যদি আঘাত লাগে?

জানালাটা মুখের সামনে রেখে সুরমা দেবী বসলেন—যাতে

বাইরের আলোর আভাটা তাঁর মুখে এসে পড়ে। পুরুষ মানুষ চিরদিন অবিবাহিত থাকলে মেয়েদের সর্বপ্রকার প্রসাধনের আদব-কায়দাগুলো মুখস্থ করে। তা ছাড়া সুরমার সম্বন্ধে আমার অজানা কিছু নেই।

ভ্যানিটি ব্যাগটি পাশে সযত্নে রেখে সুরমা দেবী এবার বললেন, তোমার ঘরে এসে মেয়েছেলে নাচানাচি করে? তারা নাচে, না তুমি তাদের নাচাও? নাকি তুমিও নাচো তাদের সঙ্গে?

আমি হেসে উঠলুম। বললুম, আমি কেন নাচতে যাব এই বৃদ্ধ বয়সে! ফাঁক বুঝে এক একজন আসে, এসে আমাকেই নাচিয়ে যায়!

সুরমা দেবীর গোমড়া মুখে এতেও হাসি ফুটল না। তখন বললুম, কই, মুখে পাউডার দেখছিনে, হাত-পায়ের নখে রং মাখোনি, ঘাঘরা করে শাড়ি ঘোরাওনি—তোমার হয়েছে কি? হঠাৎ সকাল না হতেই ছুটে এলে যে—?

এবার তিনি বললেন, তোমার তামাশা রাখ। আমি এবার দেখতে পাচ্ছি তুমি বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি!

বললুম, তার মানে তুমি আমাকে বুদ্ধিমান ঠাউরেছ। তাহলে বল, এতদিন তুমি তোমার ঠিক বয়সটি লুকিয়ে রেখে আমাকে বোকা বানিয়েছিলে!

সুরমা দেবী এবার রুষ্ট হাসি হেসে চোখ কপালে তুললেন। বললেন, ওমা, রাম বলো! কোন্ কথায় কোন্ কথা এল! যা মুখে আসে তাই বলছ? তোমার না মরবার দিন ঘনিয়ে এল? আমি কি সকালে তোমার কাছে তামাশা শুনতে এলুম? আমার না পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হতে চলল?

দাঁড়াও!—আমি বলে উঠলুম, আজ এস্পার-ওস্পার হয়ে যাক্। মনে রেখ আমি তোমাদের দুই পুরুষের দাদামশাই। তুমি যখন

জন্মালে আমি তখন বাইশ তেইশ বছরের সাংঘাতিক ছেলে। তখন যেন কাদের বাড়ির গিন্নির দিকে আমার চোখ পড়েছিল। সেই মহিলার নাম লিখে রেখেছি আমার ডায়েরিতে!

কেন, তার নাম লিখতে গেলে কি জন্যে?

হা কপাল! লিখব না? শোবার ঘরের জানলার দিকে আমার অবাধ্য চোখ পড়ত ব'লে ভদ্রমহিলা এক গাছা ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখতেন!

ছোট্ট রুমালখানি মুখে চেপে সুরমা দেবী এবার হাসতে লাগলেন।

আমি আবার বললুম, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! তোমাকে ঘাঘরা পরিয়ে একবার হাওড়া ময়দানে সার্কাস দেখতে নিয়ে গিয়েছিলুম। তুমি সতেরো বছরে পড়তেই তোমার বিয়ে হল। আমিই ত' তোমাকে সাতপাক ঘোরালুম! উনিশ বছর বয়সে তোমার প্রথম সন্তান হল, ওই সোমেন। একুশে পড়তেই হল মেয়ে! নরেশের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য হয়ে সমগ্র বঙ্গদেশ জনসংখ্যা-সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। নচেৎ প্রতি দু'বছরে সন্তান হলে,—বলতে নেই নরেশচন্দ্র এখন স্বর্গে—তোমার এতদিনে বারো চোদ্দটি সন্তান-লাভের স্বাভাবিক অধিকার ছিল!

চোখ পাকিয়ে উঠলেন সুরমা দেবী,—এসব নোংরা কথা কি তোমার এতই ভাল লাগে?

কোন্‌টা নোংরা?—প্রশ্ন করলুম, স্বামী-স্ত্রী নোংরা, না সন্তান নোংরা, না সম্পর্ক নোংরা? নোংরা কোথাও নেই সুরমা, নোংরা আমাদের মনে! সুন্দরকে ঘৃণ্য করে তুলি আমাদের আচরণে! নিষ্পাপকে কলঙ্কিত ক'রে তুলি আমাদের স্বভাব দোষে। তুমি এসেছ কেন আমি জানি। যদি নতুন কোনও কথা থাকে তাই বল।

এবার একটু গুছিয়ে বসে সুরমা দেবী বললেন, তুমি এখানে বসে ওদের সবাইকে নিয়ে বড়ে টিপছ কেন?

আরেকটু ভেঙ্গে বল।

ভেঙ্গেই বলছি। আমি যখন ওদেরকে বাগ মানাবার চেষ্টায় আছি, তুমি তখন ওদেরকে অবাধ্য ক'রে তুলছ কি জন্যে?

আমি হাসলুম। বললুম, আমার ওপর সোজাসুজি আক্রমণ করলে আমি ভয় পাই, পাছে কড়া কথা বলি। তুমি কাকে বাগ মানাবার চেষ্টা করছ আমি জানিনে, তবে মিলির নামে সর্বত্র নোংরা কথা রটিয়ে তাকে তুমি দেশছাড়া করেছ!

আমি?

মিলির তাই বিশ্বাস।

সুরমার মুখে-চোখে গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। বললেন, মিলি কোথায় গেছে?

আমাকে বলেনি!

হঠাৎ হাসলেন তিনি এক ঝলক। বললেন, বুঝেছি, তুমি ফাঁস করতে চাও না!

তাঁর অবিশ্বাসের উত্তরে আমিও হাসলুম,—আমাকে যতই সন্দেহ করবে, ততই তোমার অশান্তি বাড়বে, সুরমা! তোমার এই রুদ্ধ আক্রোশ দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, মিলির ঠিকানা জানিনে তাই রক্ষে। ঠিকানা পেলে তুমি তার ওখানে খাঁড়া নিয়ে ছুটে যেতে!

সুরমা দেবীর সুন্দর দুটি চক্ষু চিরদিনই দীর্ঘায়ত। কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁর সেই চক্ষু কেমন একটা কুটিল ক্রূরতায় ছোট হয়ে এল। তিনি বললেন, আজ আমার বয়সের হিসেব ক'রে তুমি বোধহয় ভালই করেছ। তোমাকে জানিয়ে রাখি, মেয়েমানুষ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব চেয়ে সাংঘাতিক এবং সব চেয়ে হিংস্র হয়ে উঠে। একথা মনে রেখ!

এবার খুব হেসে উঠলুম। বললুম, কথাটা বেশ ভালই বলেছ। এ বয়েসটা বোধহয় মেয়েমানুষের যৌবনকালের শেষ পরিচ্ছেদ।

তাই তাদের বেদনা-যন্ত্রণার সঙ্গে একটা গাত্রদাহও জন্মায়। আমি তোমাকে অনুরোধ জানাই সুরমা, মিলিকে তুমি রেহাই দাও!

রেহাই দেবো? বলতে চাও কী তুমি? - ফেটে উঠলেন সুরমা। বললেন, তুমি জান ওর বাপের চাকরি ছিল না, আমি ওদের সংসার চালিয়েছি? ওর মায়ের মরার আগে সব চিকিৎসার খরচ আমিই যুগিয়েছি? আজ পনেরো ষোল বছর ধরে ওই মেয়েটার আগাগোড়া সমস্ত খরচপত্র আমিই চালিয়ে এসেছি,—এ কি তোমার কাছে আজ নতুন কথা? আমার ওই মোটরের চাকার তলায় যদি হারামজাদিকে পিষে মারতে পারতুম তবেই আমার রাগ যেত!

ঈষৎ তামাশার স্বরে বললুম, সম্ভবত সেই ভয়েই সে পালিয়েছে! যাকগে। আচ্ছা বলত সুরমা, তুমি একটা কায়স্থ পরিবারের জন্য এত করলেই বা কেন, এবং আজ ব্যর্থ মনোক্ষোভে এত রাগছই বা কেন?

সুরমা দেবী বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না তার জন্যে আমি ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারছিনে? আমার অমন ছেলের বউ, সে আমার পর হয়ে রইল?

প্রশ্ন করলুম, কিন্তু ছেলেকে ফুসলে বার ক'রে আনবার জন্যেই না তুমি একদিন মিলিকে মোতায়েন করেছিলে? তুমি না মিলির কানে কানে বলেছিলে, তুমিই আমার পুত্রবধূ হবে?

তখন কি জানতুম আমার স্বামী চিরদিনের শত্রুই থেকে যাবে?

তা হলে দেখা যাচ্ছে সে-দোষ মিলির নয়! তোমার সেই 'পুত্রবধূ' যদি তোমার পুত্রের সঙ্গে কিশোরকাল থেকে তোমারই প্রশ্রয়ে কিছু প্রণয় চর্চা ক'রে থাকে, তার জন্য আজ তাকে মোটরের চাকার তলায় পিষে মারতে পার না!

আমার কথায় সুরমা বোধকরি একটু ধাক্কা খেয়ে থাকবেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, এসব ছেঁদো কথা অনেকবার শুনেছি।

আমি আমার মত অনুযায়ী চলতে চাই। বাধা যদি আসে তাহলে সে-বাধা আমি পায়ের নখে টিপে মারব। আমি তোমাকে সত্যিই এবার বলছি, স্বামী যত অবিচারই আমার 'ওপর ক'রে গিয়ে থাকুন না কেন, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে,—স্বামীর ব্যবস্থাই আমি মেনে চলব!

তা হলে এক কাজ করো, সুরমা—আমি হেসে বললুম, সকলের আগে তোমার শোবার ঘর থেকে আমেরিকান্ অভিনেত্রীদের ছবি সরিয়ে স্বর্গত নরেশচন্দ্রের একখানা ছবি ঠাঙ্গাওগে! তাহলে লোকে তোমার হিন্দুয়ানিতে কতকটা বিশ্বাস করতে পারবে। তোমার স্বামীর ব্যবস্থা তুমি যদি মেনে চলতে পারতে, আমি একটুও দুঃখিত হতুম না। কিন্তু তুমি কি মনে কর, চারুলতাকে তুমি পুত্রবধ্ হিসাবে তোমার বাড়িতে এনে তুলতে পারবে?

সুরমা বললেন, মিলি সরে যাক্, কালই আমি চারুলতাকে আনব!

. এ বিশ্বাস কেমন ক'রে তোমার হল?

সে হিন্দুর মেয়ে, শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের ঘরে তার জন্ম। তার বিয়ে 'হয়েছে হিমন্দুতে। নিষ্ঠাবতী সেই মেয়ে!

এবার আমি হাসলুম। বললুম, আমি যদি বলি শ্বশুর বাড়ির সম্বন্ধে সেই মেয়ের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা অথবা মোহ নেই? যদি বলি তোমার এবং তোমার ওই বাড়িটির সম্বন্ধে সেই মেয়েটির বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই?

সুরমা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, কেমন করে থাকবে? মেয়েমানুষের জীবনে সতীনও বরং একদিন সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু এখানে স্বামীর মন বেআইনী প্রণয়ে আসক্ত, একি কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে বরদাস্ত করে?

ভুল করছ সুরমা,—আমি বললুম, একথাও তোমার সত্য নয়।

শুধু প্রণয়ের কথা এক্ষেত্রে বললে ঠিক বলা হবে না। চারুলতা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সোমেন তার স্বামী হয়ে ওঠেনি! সে বিশ্বাস করে মিলি সোমেনের স্ত্রী!

মিলি নিশ্চয় চারুলতার কাছে গিয়ে এই কথা বুঝিয়েছে?

না,—আমি বললুম, তোমার ছেলেই একথা চারুকে বিশ্বাস করিয়েছে। রাগ করো না সুরমা, সর্ষের মধ্যেই ভূত!

সুরমা বললেন, হুঁ, এখন একটু একটু ক'রে সব বুঝতে পারছি! এর পরেও তুমি মিলিকে ক্ষমা করতে বল, কেমন? এতদিনে আমার ভুল ভাঙছে। আমার স্বামী যত মন্দই হোন, এই কালনাগিনীকে তিনি চিনতে পেরে রাতারাতি ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমাকেও আমি বলে যাচ্ছি, মিলিকে আমি সহজে ছাড়ব না।

এবার আমি খুব হেসে উঠলুম। বললুম, সুরমা, এইগুলোকেই বোধ হয় বলে ভাগ্যের বিদ্রূপ! সবাইকেই তুমি একে একে চেয়েছিলে,—স্বামী, সংসার, সন্তান, পুত্রবধূ, এমন কি মিলিকে পর্যন্ত। কিন্তু আশ্চর্য, আজ তোমাকেই কেউ চাইছে না। সবাই তোমার সংসর্গ ত্যাগ ক'রে পালাতে চাইছে! যাদের কাছে তোমার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রত্যাশা,—অর্থাৎ স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ,—তারা একে একে তোমার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল!

সুরমা দেবী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলেন।

আমি পুনরায় বললুম, আমি ধরে নিচ্ছি মিলিকে তুমি যেখানে পাবে ধরে ঠ্যাঙ্গাবে! বেশ, বুঝলুম সে না হয় কালনাগিনী! কিন্তু তুমি কি এতে ফিরিয়ে পেলে তোমার ছেলের বউকে? তুমি কি ছেলের কাছ থেকে ফিরে পেলে সেই মাতৃভক্তি আর শ্রদ্ধা? ফিরে পেলে কি পুত্রবধূর কাছ থেকে সম্মান আর সমাদর? আমি তোমাকে বলে রাখছি সুরমা, ও ছেলে তোমার নয়। দুবছর বয়সে

তুমি কেবল জিদ বজায় রাখতে গিয়ে যে প্রথম সন্তানকে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছিলে, এবং তোমার সুশিক্ষিত ছেলের মনে তার জন্য যে পর্বত পরিমাণ ঘৃণা জমে রয়েছে, সেটি তুমি আজও বোধও হয় স্পষ্ট করে দেখতে পাওনি! আর ওই পুত্রবধূ? ওর মনের প্রকৃত ভাবটি তোমার সম্বন্ধে কি প্রকার, সেটি ভাল করে জানলে তুমি সাত হাত মাটির তলায় নেমে যেতে! তার চেয়ে যাও, নিজের বাড়িতে পিসিমা হয়ে থাকোগে। ভাইপো আর ভাইঝিদেরকে তোমার গাড়িখানা দিয়ে রোজ ইস্কুলে পৌঁছে দাওগে! এখনো সময় আছে, যদি পার ভাইবৌদের মন রেখে চলোগে।

সুরমা দেবীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিল। জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে তিনি মুখ নত করলেন।

আমি বললুম, ভয় করে, তোমার ওই শূন্যপুরী খাঁ খাঁ করবে একদিন তোমার চারদিকে। সঙ্গীহীন একা তোমার ওই মস্ত বাগানবাড়ি! আমি জানিনে তোমার পরিণাম কি। শুনতে পেলুম ভাই আর ভাইবৌদের সঙ্গেও তোমার তেমন বনিবনা নেই! আমি জানিনে আমার মৃত্যুর পর আর কেউ তোমার খোঁজ-খবর নেবে কিনা।

অলক্ষ্যে একবার চোখ দুটো মুছে সুরমা নিঃশব্দে এক সময় উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বছর খানেক বোধ হয় হতে চলল সোমেন এবং মিলির খবর আমি জানিনে।—

মনে করেছিলুম চারুলতার দলিলখানা যথারীতি সোমেনের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করব। কিন্তু তা হয়নি। সে-দলিল আমার কাছেই থেকে গেছে।

সুরমা দেবী কয়েকবারই আমার এখানে আনাগোনা করেছেন, এবং আমিও তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্লাড-প্রেসার, অম্লশূল, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি উপলক্ষ্য ক'রে কয়েকবার তাঁর গাড়িতে চড়ে তাঁকে দেখাশোনা করতে গেছি। জনৈক ডাক্তার তাঁর গৃহ চিকিৎসক হয়ে আছেন। তিনি ডাকামাত্রই আসেন। সুরমা দেবীর নতুন একটি উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। তিনি সারাদিন ধরে নানাবিধ ঔষধ সেবন করতে ভালবাসেন। ডাক্তার সেটি জানেন, এবং তাঁর বিশেষ পরিচিত একটি দোকান থেকেই দামি-দামি ঔষধগুলি আসে। রোগী একটু বেশি নার্ভাস বলেই ডাক্তারকে যখন তখন আসতে যেতে হয়। সুরমা দেবীর শয়ন কক্ষে সম্প্রতি দুটি মাঝারি ধরণের আল্‌মারি বসেছে তাঁর পালঙ্কের দুই পাশে। ও দুটি তাঁরই ঔষধপত্রে ভরা। যখন অম্লশূল থাকে না, তখন দেখা দেয় শিরঃপীড়া। হৃদ্‌রোগ যখন কমে, তখন বার বার ব্লাড-প্রেসার দেখতে হয়। প্যাথলজির চিকিৎসায় তরুণ ডাক্তারটি নাকি বিশেষ পারদর্শী, এবং রোগিনী নাকি একদা শুনতে পেয়েছিলেন, যথাসময়ে তাঁর চিকিৎসা ধরা হয়েছে তাই রক্ষা,—নৈলে এসব রোগের ভয়াবহ পরিণাম ঘটতে পারত। কি প্রকার পরিণাম ঘটতে পারত, অথবা সেটি ঘটলে ভাল হত কিনা সে-আলোচনা অবশ্য আমি করিনি। বলা বাহুল্য,

এ ধরণের রোগীর সংস্পর্শে এলে ডাক্তারদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

পরম্পরায় কানে এসেছিল সুরমা বুঝি এর মধ্যে হবে যেন এই তরুণ বয়স্ক ডাক্তারটিকে সঙ্গে নিয়ে একদিন চারুলতাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে পুত্রবধূকে ওয়াকিবহাল করাই নাকি তাঁর যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেখান থেকে তিনি হৃদ্‌রোগ অথবা ব্লাড-প্রেসার নিয়ে ফিরে এসেছিলেন কিনা সে-খবর আমি পাইনি। তবে আর কোনদিনই তিনি পুত্রবধূর কাছে কোনওপ্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে যাবেন না,— এবম্বিধ সংবাদটি আমি শুনতে পেয়েছিলুম।

আমার ওই যাতায়াতের মধ্যেই একদিন সুরমাকে বলে এসেছিলুম, তোমার অসুখ বিসুখে একজন ডাক্তার দেখাশোনা করছেন এটা খুব সুখের কথা, সুরমা। আমারও মাঝে মাঝে আজকাল যেন শিরঃপীড়া এবং পায়ে বাতের বেদনা দেখা দিচ্ছে। ভাবছি এবার একজন নার্স রাখব!

সম্ভবত সুরমা দেবী একটু বাঁকা চোখে আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। আমার ধারনা, তিনি আমার অসুখের কথাটা বিশ্বাস করেন নি। বরং আমার বক্তব্যের মধ্যে তিনি বিদ্রূপের গন্ধ পেয়েছিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে ভাবলুম, সুরমা দেবী সময় মতো আমেরিকায় গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধান মেনে চলতে পারতেন, এবং আমিও যথাসময়ে আমার পরলোকগতা পিসিমার সদুপদেশ গ্রহণ করলে ভাল করতুম!

যাই হোক, নার্স রাখার কথা আপাতত স্থগিত রেখে ধর্মকর্ম করার কথা যখন ভাবতে বসেছি, সেই সময় একদিন হঠাৎ একখানা চিঠি এসে হাজির হল। চিঠিখানা দীর্ঘ। লিখেছে মিলি।

বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের একটি অতি অখ্যাত গ্রাম থেকে চিঠিখানা এসেছে।—

"বুড়োদাদু, আশা করি তুমি বেঁচে আছ। আমরা এক বছর আগে কারোকে না জানিয়ে জলপাইগুড়ি চলে যাই। সেখানকার ছোট ইস্কুলে একটি কাজ পেয়ে একমাসের মধ্যেই আমরা বিয়ে করি। বিয়ে হয় রেজেষ্টারী ক'রে। একটি সামাজিক ও শাস্ত্রীর অনুষ্ঠানও হয়। উনি আইন-কানুন বাঁচাবার জন্য নিজের নামটি বদল ক'রে 'সোমনাথ' রাখেন। কিন্তু এর ফলাফল এই দাঁড়ায়, সোমনাথ নামক ব্যক্তিটির কোনও সার্টিফিকেট নেই,—যার সাহায্যে কাজকর্ম জোটে। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই এখানে নানা রকম কানাকানি এবং গুজব রটে। ইস্কুলের চাকরিটি আমি ছাড়তে বাধ্য হই। আমাদের খরচপত্রের বিশেষ অভাব ঘটে। পাড়ার লোকজন যখন চারিদিক থেকে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল তখন একদিন রাত্রের দিকে আমরা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে বাধ্য হলুম। আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য না থাকার জন্য কয়েকদিন অবধি এখানে ওখানে থাকতে হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে যাবার মতো সাহস আমাদের হয়নি, কেননা—বুঝতেই পারছ, শত্রুতার ভয় ছিল। অবশেষে আমার এক মাসতুতো মামার বাড়ি বর্ধমানে গিয়ে উঠেছিলুম। মামা বর্ধমানের ষ্টেশনে কাজ করেন। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে নানাবিধ নোংরা খবর আগেই তাঁদের কানে উঠেছিল। সুতরাং তাঁদের ওখানে থাকা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক মনে হল না। তা ছাড়া আমি কায়স্থ কন্যা হবার জন্য তাঁদের বাড়িতে অনেক অসুবিধা ঘটছিল। এমনি অবস্থায় আমার এক মামাতো ভাই এই গ্রামের একটি কারিগরি কেন্দ্রে আমার একটি কাজ যোগাড় করে দেয়। আমার স্বামী এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি ধানকলে সামান্য একটি কাজ পেয়েছেন। উনি যে-কোনও বড় ইস্কুলে কিংবা

কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেতে পারতেন, কিন্তু উনি নিজের সত্য নামটা কোনমতেই আর কোথাও প্রকাশ করতে প্রস্তুত নন্। এ সম্বন্ধে উনি কেবলমাত্র তোমার পরামর্শ পেলে গ্রহণ করবেন। ওঁর ভয়, পাছে এই বিবাহের সংবাদ প্রকাশ পেলে মামলা মোকদ্দমা এবং কেচ্ছা-কলঙ্কে আমাদের সামাজিক জীবন ঘুলিয়ে ওঠে।

"আমরা একটি কাঁচা ঘরে থাকি। উনি সকালে বেরিয়ে যান্, ফেরেন সেই সন্ধ্যের পর। নানা কষ্ট আছে এখানে, তবে এসব সহ্য হয়ে যাবে। আমি এখানকার ব্লকে মেয়েদের সঙ্গে সামান্যই কাজ করি। দুজনের যাহোক করে চলে যায়। আমার শরীর কিছুদিন থেকে তেমন ভাল যাচ্ছে না।

"হাসির কথা এই, ওঁর পক্ষে আত্মপরিচয় না দিলে কোনও মতেই উন্নতি হবার আশা নেই। আবার এদিকে আত্মপরিচয় দেবার ফলে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে মামলা মোকদ্দমায় উনি জড়িয়ে পড়েন, তবে ওঁর পক্ষে রেহাই পাবার সম্ভাবনাও কম। প্রণাম নিয়ো।—মিলি।"

সোমেন ছদ্মনামে বিবাহ করবে এটি ভাল কিংবা মন্দ—এ আমি জানিনে। এটি বুঝলুম, হিন্দুবিবাহের প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল বলেই ওটাকে সে উড়িয়ে দিতে চায়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, এর পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করার মতো তার বয়ঃপ্রবণতা নেই।

এর অন্য দিক ছিল যেটি আমার কাছে শ্রদ্ধেয়। সমস্ত বিরোধ এবং বাধাকে অস্বীকার করে সে আপন অবিচল সত্যে দাঁড়িয়ে রইল! কিন্তু যেটি সে ত্যাগ করল, সেটির ক্ষতিপূরণ এ জীবনেও সে পাবে না। সেটি তার উচ্চ শিক্ষাদীক্ষার পরিচয়। পুরুষ মানুষ যে-পরিচয়টুকুর সাহায্যে অন্ন সংগ্রহ করে, সমাজ ও অর্থনীতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি তার ভবিষ্যকালের সর্বপ্রকার সংস্থান, সেটিকে সে চিরদিনের জন্য অকাতরে বিসর্জন দিল! স্বার্থত্যাগের এমন মহৎ রূপ আগে আমার জানা ছিল না।

সোমেনের' সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেলুম বটে, কিন্তু কেমন একটি অপরিসীম শ্রদ্ধায় আমার অন্তরাত্মা ওই ছেলেটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার জন্য আকাশপথে ধাবমান হল।

এই কি ভালবাসা?—আমি জানিনে। শুধু মোহ?—তাই বা কেমন করে বলব? দশ বারো বছর ধরে দুটি শিক্ষিত ছেলে ও মেয়ের মনে এই বিভ্রান্তিকর মোহের আবিলতা থাকবেই বা কেন? মোহই যদি হয় তবে এটি সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভালবাসার প্রতি এই সত্যমূল্যদান আমাকে অভিভূত করেছিল।

চিঠি পাবার পর কয়েকদিন আমি চুপ করে ছিলুম। অতঃপর আমার ভাবোচ্ছ্বাসটি যখন কিছু কমে এল, আমি মিলির চিঠির একটি জবাব পাঠালুম:

মিলি, তোমার চিঠি পেলুম। তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখী, সচ্ছল এবং আনন্দময় হোক, এই কামনা করি।

তোমরা দুঃখবরণ করেছ। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে তোমাদের গৌরব অম্লান হয়ে থাকবে। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি।

হৃদয়ের একনিষ্ঠ সত্যকে অবিচল রাখার জন্য তোমার স্বামী বিস্ময়করভাবে যে ত্যাগ স্বীকার করল, সেটি মহৎ হয়ে থাকবে চিরদিন। তোমরা কোনদিন ভয় পেয়ো না। চারিদিকের দুঃখ, দুর্যোগ, দুর্দশা ও অসম্মান তোমাদের প্রাণের প্রদীপকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার পত্রের অন্যান্য কথার জবাব আমার কাছে নেই। কেবল এইটুকু অনুরোধ জানাতে পারি, আমার বাড়ির দরজা চিরদিন তোমাদের জন্য খোলা রইল। তোমরা যেদিন যখন খুশি চলে এস, এবং যতদিন অবধি তোমরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পার, ততদিন অবধি তোমাদেরকে সর্বপ্রকারে প্রতিপালন করব।

তোমাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারিনি, সেজন্য আমার দুঃখ আছে। আজ আমি আশীর্বাদী স্বরূপ কিছু টাকা তোমার নামে পাঠালুম। এই উপহার গ্রহণ করে আমাকে আনন্দ দিয়ো। তোমার স্বামী শিক্ষিত, কর্মঠ এবং চিন্তাশীল,—বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে কোনও পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। আরেকটি কথা। শ্রীমতী চারুলতা তার প্রতিশ্রুতি ভোলেনি। প্রায় বছর খানেক আগে একখানা পাকা দলিল সম্পাদন করে সে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সে দলিলটি তোমাদেরই জন্য, এবং সেটি দেখলে তোমরা খুশী হবে। ইতি—

চিঠি এবং টাকা পাঠিয়ে আমি যখন একটু পরিতৃপ্তভাবে বিশ্রাম নিচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন চারুলতার বাবার কাছ থেকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এল। তাঁর নিজের হাতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা।—গ্রামে তাঁদের প্রস্তাবিত কলেজটির সংলগ্ন একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভিত্তিস্থাপন করা হবে, এই উপলক্ষ্যে আমি যদি আগামী ২২শ তারিখে তাঁদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হই তবে তাঁরা সকলেই কৃতার্থ বোধ করবেন।

চব্বিশ পরগণার এক গ্রামের চিঠি কলকাতায় এসে পৌছল চতুর্থ দিনে। স্বাধীন ভারতের ডাকবিভাগ বহু কাজে ব্যস্ত, চিঠিপত্র বিলি করার সময় বড় কম। আজ এসে পৌছল তাই রক্ষা। আজই সেই ২২শ তারিখ। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলুম।

সুরমা দেবীর জন্মগ্রহণের বছর তিনেক আগে আমার বৃদ্ধা পিসি অনুগ্রহপূর্বক পরলোকগমন করেন। বিগত বিয়াল্লিশ বৎসর যাবৎ তাঁর দত্তকপুত্র হিসাবে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি মোটামুটি বড়মানুষি চালেই ভোগ করে আসছি। অবশ্য যৌবনকালে আমার চরিত্ররক্ষার খাতে কতকটা ব্যয়বাহুল্য ঘটে গেছে বটে, তবে দারপরিগ্রহ বা

সংসারধর্মের খাতে কোনও অপব্যয় হয়নি। সুতরাং এই বৃদ্ধ বয়সে দুচারদিন যদি এখানে ওখানে মোটরগাড়ি চড়ে বেড়াই সেটা এমন কিছু অন্যায় নয়। অবশ্য অনেককাল থেকে আমার একটি স্বাভাবিক সম্ভোগপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা এককালে নাকি রটিয়েছিল, আমার বাড়িতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে আমি নাকি নিষিদ্ধ মাংস ও পানীয়র আয়োজন করতুম। এটা অত্যন্ত মিথ্যা কথা। আমার সত্তর বছর বয়সের স্বীকারোক্তি শুধু এইটুকু বলে, মাঝে মাঝে আমার খাদ্য ও পানীয়র তালিকাটা শুদ্ধাচারী হিন্দু-সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলতে চায় না। লোকে ভুলে যায় আমি একটা মস্ত অনর্জিত সম্পত্তির মালিক। যে-অর্থ কষ্টার্জিত এবং শ্রমলব্ধ নয়, তার অপব্যয় গায়ে লাগে না।

আমার ট্যাক্সি যখন চারুলতাদের গ্রামের বাড়ির সামনে এসে থামল তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল। আমার বাড়ির ভৃত্য ফটিক আমার সঙ্গে ছিল।

এখানে শেষবার এসেছিলুম সুরমা দেবীর সঙ্গে। কিন্তু সেই আড়ষ্ট আবহাওয়া এ যাত্রায় নেই। আমার গাড়ির চারিদিকে নানা লোক এসে জড়ো হলেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। চারুলতার বাবা হরিমোহন, তাঁর বড় মেয়ে, এবং চারু এসে হাসিমুখে আমাকে নামাল।

অদূরবর্তী প্রাঙ্গণে একটি মস্ত আটচালা বাঁধা হয়েছে। ওইখানেই প্রস্তাবিত পাঠাগারটির জন্য পাকা একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। এই উপলক্ষ্যে আমি কিছু বই প্যাকেট বেঁধে এনেছিলুম চারুলতাকে দেবার জন্য। মোট চারটি প্যাকেট একে একে ফটিক গাড়ি থেকে নামাল। ইংরেজি ও বাঙ্গলা—নতুন এবং পুরনো,—মোট একশ'খানা বই এনেছিলুম। এগুলি কলেজের নানা দরকারি কাজে লাগবে। লাইব্রেরীর পক্ষে এগুলি মূল্যবান।

চারুলতা সযত্নে এবং সানন্দে সেই বইগুলি আটচালার ভিতরকার আসরের মাঝখানে সাজিয়ে রাখতে নির্দেশ দিল। নিকট ও দূরের গ্রাম থেকে নানা লোকজন এসেছে।

উৎসবের অংশটা সকালের দিকে হয়ে গেছে। সুতরাং প্রধান অনুষ্ঠানের বাকি কিছু নেই। অপরাহ্নে বোধ করি গান এবং কথকতার একটা পালা আছে।

ওরই এক ফাঁকে চারু এসে আমার হাত ধরে বলল, তুমি এসে আমার মান রাখলে, দাহু। বইগুলো পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে। এখন ওদের সঙ্গে বসে তুমি খানিকটা পাকা চুলের গল্প করগে।

তারপর?—আমি হাসলুম, আমার কথা আছে যে রে!

চারু এক গাল হাসল। বলল, তাইত বলছি, কথা কি আমারই কম? আমি ঠিক সময় আসব, তারপর ছোঁ মেরে তোমাকে নিয়ে যাব ওই সেই বকুলতলার দিকে। ভারি মজার কথা আছে বলে রাখলুম। এখন যেন্ কিছু খেতে চেয়ো না!

আমি উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলুম।

চারু চলে যাচ্ছিল, আবার ছুট্রে ফিরে এল। বলল, শোন, এখানে সব্বাই ভাবে আমি বড্ড শান্ত মেয়ে, আমার মুখে নাকি কথা ফোটে না। শোন দাহু, আমি তোমাকে আড়ালে বলব 'তুমি'— কিন্তু অন্য কেউ সামনে থাকলেই 'আপনি' 'আজ্ঞে' করব—বুঝেছ? তুমি যেন বোকার মতন আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ো না! এটা গ্রাম, মনে রেখ।

আমি পুনরায় হেসে উঠলুম। চারুলতা হনহনিয়ে চলে গেল।

গ্রামের যাঁরা মাননীয়, তাঁরা আমাকে নিয়ে আসরের প্রায় মাঝখানে বসিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তাঁরা ভদ্রমণ্ডলী। অনেকেই পণ্ডিত এবং আমার সমবয়স্ক। এখানে এখনও সংস্কৃত টোল আছে, সেই টোলে পড়েছে চারুলতা। ওরা হুই বোনই আশ্চর্য

মেধাবী ছাত্রী।. একজন বললেন, অত্যন্ত বেদনার কথা, হরিমোহনের বড় মেয়েটি অল্প বয়সে বিধবা হল, এবং ছোট মেয়েটির বিবাহিত জীবন সুখের হল না। দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব!

আমি এসেছি চারুলতার শ্বশুরবাড়ির সুবাদে। ওঁদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে আমার মুখ থেকে ওঁরা কিছু মন্তব্য শুনতে চান। আমি বললুম, দুর্ভাগ্য কিনা ঠিক জানিনে। তবে ওই ভাগ্যেরই বোধহয় একটা চক্রান্ত আছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বটেইত! কথাই তাই।

বললুম, ভাগ্যের চক্রান্তেই আজ ওই মেয়ে নেমে এসেছে জনকল্যাণ কর্মে। ওদের তথাকথিত দুর্ভাগ্যের মধ্যেই গ্রামের সৌভাগ্যের সূচনা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্যকেন্দ্র,—এগুলি ওরাই গড়ে তুলছে!

কথাই তাই! চোখ যার আছে সেই দেখছে ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের মধ্যেই মঙ্গলের সঙ্কেত। আমরা বুঝি কতটুকু?

একজন একটু আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, ছেলেটি তবে সত্যই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছে! খবর কিছু পেলেন আপনারা?

বুঝলুম এঁরা সোমেনের কথা তুলতে চান। ভেবেছিলুম চুল পাকবার পর মিছে কথাগুলো আর বলব না। কিন্তু একটি পলকেই সেই প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। বললুম, আমিও সেটি জানতে এসেছিলুম নাতবৌর কাছে!

একজন বললেন, চারুর কথা! তবেই হয়েছে। লেখা-পড়া জানা মেয়ে ত, বড্ড চাপা! তবে হ্যাঁ, মেয়ের মনে দুঃখের লেশও নেই! এ মেয়ে জন্মেছে আমাদের গ্রামের উন্নতির জন্যে। শোক দুঃখ মনস্তাপ এ মেয়েকে ছুঁতেও পারে না!

সে একশবার! কথাই তাই!

ঘণ্টাখানেক আলাপ-আলোচনা হল কিনা সন্দেহ, এমন সময়

বড় বেহাইয়ের বড় ছেলেটি এসে আমাকে আসর থেকে তুলে নিয়ে গেল। বলল, আপনি আসুন দাদু, কাকা ঠাকুমা বাবা আপনার জন্য বসে আছেন।

ভিতর মহলের দর দালানে এসে যখন দাঁড়ালুম, তখন বাড়ির ছোট বড় মেয়ে পুরুষ এবং কর্তারা একে একে এসে পায়ের ধূলো নিতে লাগলেন। হরিমোহনের বিধবা মেয়েটির পরে এবার চারু তার মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টেনে কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

আমার জন্য আহারাদির আয়োজন করা হয়েছিল। মস্ত থালা সাজিয়ে চারুর মা বাবা ঠাকুমা ঘিরে বসলেন। সকলেই এঁরা জানেন আমি চারুর শ্বশুর-শাশুড়ীর দাদামশাই সম্পর্কে হই। সুতরাং আমার খাতিরও যেমন, আমার চারিদিকে হাসি-তামাশাও তেমন। কিন্তু চারুর স্বভাব সংযম, গাম্ভীর্য এবং বিনীত ভাবটি ঠিক একরকমই রইল। এক সময় আমি বললুম, ছোট বেয়ান, এঁটি বরাবরই লক্ষ্য করেছি, শ্রীমতী চারু আপনার খুবই শান্ত মেয়ে। এ মেয়ে শিক্ষকতার কাজ কেমন করে সম্পন্ন করছে এটি খুব ঔৎসুক্যের বিষয়।

ছোট বেয়ান ঘোমটা টেনে বললেন, পড়াশুনো নিয়েই থাকে! বড্ড লাজুক মেয়ে! যা করে নিজের মনে।

হরিমোহন শুধু বললেন, আপনি আশীর্বাদ করুন ওর সব চেষ্টা যেন সফল হয়!

চারু একপাশে সকলের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সেই লাজনম্রভাবটির মধ্যে নিখুঁত অভিনয়টি লক্ষ্য করে আমি খুব কৌতুক বোধ করছিলুম। প্রকাশ্যে আন্তরিক আশীর্বাদ জানালুম।

রৌদ্র প্রখর হয়ে রয়েছে। আহারাদির পর ছোট বেয়ান চারুকে ডেকে বলে দিলেন, দোতলার দক্ষিণের ঘরে নিয়ে গিয়ে দাদামশাইকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। তুমি কাছে থেকো, মা।

লাজুক মেয়ে চারু, সকলের সামনে গলার আওয়াজ করে সে মায়ের নির্দেশের জবাব দিতে পারল না। শুধু স্মিত নতমুখে তার সম্মতি জানাল। আমি এখানে সর্বাপেক্ষা বেশি বয়স্ক, সেই কারণে আমি সকলের সঙ্গে হালকা ধরণের হাসি পরিহাস ক'রে যাচ্ছিলুম।

চারুলতা আমাকে দোতলার একটি নিরিবিলি ঘরে নিয়ে গিয়ে সর্বাগ্রে টান মেরে মাথার ঘোমটা খুলে ফেলে হাসল। বলল, বছর চল্লিশেক আগে কি ভাগ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, দাদু ?

আমি ঘর ফাটিয়ে এবার হেসে উঠলুম।

চারু বলল, আমি গ্রামের লোকের ভয়ে না হয় একটু লোক-দেখানো বৌ-গিরি করলুম! কিন্তু তুমি! তুমি কী না করলে! একেবারে যাকে বলে নিখুঁত অভিনয়!

বললুম, বাপের বাড়িতে ধরে এনে বুড়ো মানুষকে এই সব অপবাদ দিচ্ছিস ?

তুমি বুড়ো ?—চারুলতার উদ্দাম কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ, বুড়ো ত নিশ্চয়ই! কিন্তু সাংঘাতিক বুড়ো!

প্রবল হাসির তরঙ্গ তুলে চারু বাইরে যাচ্ছিল. কিন্তু থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বলে গেল, একটু বিশ্রাম করো দাদু, আমি ততক্ষণ কিছু মুখে দিয়ে আসি।

এর আগে কয়েকবারই এখানে এসেছি বটে, কিন্তু এ-মহলে এই প্রথম। দক্ষিণে বড় বড় দুটো জানালা আমবাগান আর বাঁশবনের দিকে খোলা। দূরে একটা নারকেলকুঞ্জে চোখ পড়ছে। পূর্ব-দিকের জানালায় ফিরে দেখা যায় মস্ত এক দিঘি,—সাদা শালুকে ভর্তি। কয়েকটা হাঁস তারই ফাঁকে ফাঁকে সাঁতরাচ্ছে। আমরা কলকাতার লোক। বাড়ি আমাদের যত বড়ই হোক, তার বাইরে প্রাণের যোগ আমাদের যথেষ্ট নয়। এখানে চোখের সঙ্গে ঘন

কোমল হরিৎবর্ণ বনবাগানের মধ্যে মনও ছাড়া পাচ্ছে, এবং সমস্তটাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এখানে আমার সুবাদ কম। সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পেঁয়াজের খোসার মতো ছাড়াতে ছাড়াতে শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছে। আমার দাবি কিছু নেই, শুধু কোন্ অতীত কালের কবে থেকে যেন দলে ভিড়ে গিয়েছিলুম। সংসার-ধর্ম করিনি কিন্তু প্রাণধর্মের তাগিদে কারোকে অনাত্মীয় মনে হয়নি। বোধ হয় ইংরেজিতে আমাদের মতো ব্যক্তিকেই 'প্যারাসাইটস্' অথবা 'হ্যাঙ্গারস´-অন্' বলা হয়ে থাকে।

তা হোক। প্রায় সত্তর বছর আমার বয়স হতে চলল, এখন আর অপযশ লাভ করলে বেদনা বোধ করিনে। কিন্তু একালে যা দেখে গেলুম, তার জন্য শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছি। হয়ত আমাদের কালেও ছিল সোমেন, মিলি কিংবা চারু,—কিন্তু তারা বাহির হবার পথ পায়নি। হয়ত তারা পারিপার্শ্বিক মূঢ় জনসমাজের অন্তরালে মাথা ঠুকে শেষ হয়ে গেছে। তারুণ্যের উন্মত্ত রক্ত হয়ত নিছক প্রণয়ের জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সংসার ছেড়ে সেদিনও চলে গেছে, কিন্তু আজ সোমেনের সর্বাত্মক স্বার্থত্যাগের মতো কাহিনী আমাদের কালে যথেষ্ট সংখ্যক ছিল না! মেয়ে পুরুষের ভালবাসা এক জিনিস,—তার মধ্যে অভিনব নাটকীয় সংঘাত আছে, নূতনতর হাসি কান্না বা দুঃখ বেদনা আছে, হয়ত বা বিভিন্ন বৈচিত্র্যও আছে! মানলুম,—কিন্তু আমি সেকালের সেই অবিনাশ রায়,—একালের জরাজর্জর বৃদ্ধ,—আমি আবার বলে যাচ্ছি প্রণয় এবং প্রেমের তপস্যা এক বস্তু নয়! আমার যৌবনকালে বৈঠকখানার নোংরামি দেখেছি, থিয়েটার মহলের মাতলামি দেখেছি, ফুলবাগানে ঢুকে তদানীন্তন অভিজাত মহলের ইতর বৃত্তি—এ সবই দেখে এসেছি। তার পরের কালে দেখলুম, রামের বউ শ্যামের ভাড়াটে বাড়িতে উঠল, যদুর বউকে

নিয়ে মধুর সঙ্গে মামলা বাধল। দেখে এলুম মেয়ের হাতে মদের গেলাস, মেমের কোমর ধরে স্বামীর নাচ, টাকার জন্য স্ত্রী বেচা-কেনা— এবং এদের সঙ্গে ইংরেজী সমাজের যত পঙ্কিলতা! ভালবাসার ওপর ধাক্কা খেয়ে সেকালে মাতাল ভদ্র সন্তানরা পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াত, এবং সেই খবর পেয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরাও জানালার ফাঁক দিয়ে মাতালের কান্নাকাটি দেখে তারিফ করত।

অনেক মন্দর সঙ্গে অনেক ভাল মিলিয়ে থাকে সকল কালে। সেকালে রাণী ভবানী সম্ভব ছিল, কিন্তু চারুলতাদের দেখা পাওয়া যেতো না। টুলো পণ্ডিতের ঘরে মেয়ে যে সংস্কৃত পড়েনি তা নয়; কিন্তু বহুব্যাপী সমাজকর্মে অল্প বয়সের মেয়ে নেমে আসবার পক্ষে বাধা ছিল অনেক। অসাধারণ পরিবার সেকালে মাথা তুলত, কিন্তু সাধারণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসত না কেউ সহজে। অনেক ছেলে স্বকৃত হয়েছে, কিন্তু মেয়ে ছিল মুখ-চাওয়া।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই চারু এসে দাঁড়াল। একটি ছোট পিতলের পাত্রে এনেছে লবঙ্গ এলাচ জোয়ান এবং কাটা সুপারি। আমার সামনে সেটি রেখে বলল, দাদু, সকলের আড়ালে একলা বসে তোমাকে আবার প্রণাম জানিয়ে বলছি, বইগুলো দিয়ে তুমি আমাদের মস্ত উপকার করেছো। কলেজ করতে যাচ্ছি নতুন ছাঁচ নিয়ে। কিন্তু কী দিয়ে নতুন? সায়েন্সের কথা ছেড়েই দাও, আর্টস-এও সব গেছে বদলে। ইকনমিকস-এ পাস করে ছেলে মেয়ে বেরোবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রটা তাদের বিদ্যে-বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে না। লজিক, এডুকেশন, হিষ্টরী—সবেতেই ফ্যাকড়া!

প্রশ্ন করলুম, সায়েন্সের কি করবে?

সে আমাদের সাধ্যের অতীত, দাদু। অথচ ওইটিই আজ বেশি দরকার। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—। আজ

সকালে কালেক্টর এসেছিলেন, এস-ডি-ও তাঁকে বুঝিয়ে বলেছেন অনেকটা—বলতে বলতে চট ক'রে চারুলতা পিছনের কাপড় টানল।

বাড়ির একটি চাকর এসে ঢুকল। তার হাতে এক গেলাস ডাবের জল। গেলাসটি নিয়ে চারু আমার সামনে ধরে বাঁ-হাতে মাথার ঘোমটা একটু টেনে বলল, একটু খেয়ে নিন্ দাদামশাই—

জলটুকু খেয়ে চাকরের হাতে গেলাস দিলুম। সে চলে গেল।

এবার মাথার ঘোমটা সরিয়ে হাসিমুখে চারু বলল, দাদু, তুমি বুঝতে পারনি, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্যে শুধু তোমাকে নেমন্তন্ন করিনি। আরেকটা কারণ ছিল।

মুখ তুলে বললুম, কি রে ?

চারুর নত মুখ এবার একটু রক্তাভ হল। তারপর বলল, মিলিদির স্বামী আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন !

চারুলতার মুখের দিকে আমি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। তারপর শুধু বললুম, ও, তা বেশ ত। কবে পেলি চিঠি ?

এই সপ্তাহখানেক হল। ওঁরা তোমার চিঠি আর টাকা পেয়েছেন।—এই বলে চারুলতা ঈষৎ মলিন হাস্যের সঙ্গে পুনরায় বলল, সোমেনবাবু নিজের নাম বদল করে সোমনাথ করেছেন, এটি নাকি আমাকে জানানো বিশেষ দরকার ! কিন্তু এতে আজ আর কি আসে যায় দাদু ? সোমেন আর সোমনাথ আমার কাছে একই কথা !

না রে ভাই—আমি হাসলুম, তফাৎ আছে দুটোয়। সোমনাথ হল মিলির স্বামী--সে এখন দিন-মজুর, ধানকলে সে কাজ করে, একবেলা তার ভাত জোটে, আরেক বেলা বোধ হয় খই চিবোয় ! ধানকলের কাজের জন্যে রোজ দশ মাইল ক'রে তাকে হাঁটতে হয়। আমি জানি চারু, ওই হাঁটা পথে তার মনের চেহারা—

চারু শান্ত মূর্তিতে আমার পায়ের কাছে চুপ করে বসল।

তারপর বলল, দাদু, আমার কৌতূহল ক্ষমা করো,—তুমি কি ভাবছ, মিলিদিকে বিয়ে করে তাঁর অনুশোচনা হচ্ছে ?

আমি হাসলুম। বললুম, না রে, বরং উলটো। ছদ্মনাম নেবার পর এ জীবনে তার মাথা তোলবার আর উপায় নেই, একথা সে ছাড়া আর সবাই জানে। কিন্তু ওই হাঁটাপথে সোমনাথ কেবল ভাবছে, মিলি কেমন করে সুখী হবে! কেমন করে মিলির ঘরকন্না গোছাব, কেমন করে স্ত্রীকে দুবেলা খাওয়াব, কেমন করে তাকে একটু আনন্দ দেবো! সোমনাথ এই কথাই কেবল ভাবছে, মিলি তার সমস্ত জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে! সমস্ত দুর্গতির মধ্যে ওদের ভালবাসার এই প্রদীপ প্রাণের শিখাটাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে, ভাই।

চারু মৃদুস্বরে বলল, এ কি তোমার কবিকল্পনা নয়, দাদু ?

আবার আমি হাসলুম। বললুম, চারু, সত্তর বছরের এই বুড়োর পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে আজ একটু বিশ্বাস কর। তুই সোমেনকেই শুধু দেখেছিস, আর আমি যে সোমনাথের হাড়-চামড়া-মেদ-মজ্জাকে জানি, ভাই। সে বিশ্বাস করে সে ভুল করেনি। ওই দুর্দশার মধ্যে সে পরম অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। তার জীবনের মূল নক্সাটা অতি যত্নে সে নিজেই এঁকেছে!

এই জন্যেই কি উনি চিঠিতে সোমনাথ বলে সই করেছেন ?

নিশ্চয়ই!—আমি বললুম, সোমেন যে তোমার স্বামী! সেখানে মিথ্যে কিছু নেই চারু। এই গ্রামে সে টোপর মাথায় দিয়ে এসেছিল! তোমাদের বিয়েতে এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মশায় বেদশাস্ত্রের উদাত্ত মন্ত্র পাঠ করেছিলেন। তোমরা হাত মিলিয়েছিলে, মালা বদল করেছিলে, হোমের আগুন আর নারায়ণ সাক্ষী ছিল, সমাজ-জীবনের সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাদের দুজনকে বরণ করেছিল, গ্রহণ করেছিল! বল, এর কোন্‌টা মিথ্যে ? তুমি

আজ পর্যন্ত বলনি চারু যে, সোমেন তোমার স্বামী নয়। বিবাহকে তুমি অস্বীকার করনি,—তুমি শুধু এই কথাই বলে এসেছ, সোমেন হল মিলিরই প্রকৃত স্বামী,—তোমার নয়। আর সোমেন? চেয়ে দেখ, সে বিপ্লবের ধ্বজা তুলেছে, সমাজ-বিদ্রোহ করেছে। অশ্রদ্ধায় আর ঘৃণায় দাউ দাউ করে সে জ্বলছে! সে একা, উদভ্রান্ত, অবস্থা-বিড়ম্বিত,—চারিদিকের দুর্যোগ আর দুর্গতির ভিতর দিয়ে সে পথ খুঁজে ফিরছে! অন্ধকারে দিশাহারা হচ্ছে! চারু, সেই সোমেনই তোমার স্বামী, তুমি তারই স্ত্রী! আমি জানি সেই সোমেন তোমার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল, আমি জানি সেই সোমেন তোমার উদার আশ্চর্য প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রয়েছে!

আমার সুদীর্ঘ বক্তৃতা চারুকে চঞ্চল করে তোলেনি, কিন্তু সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। আমি এক সময় পকেট থেকে মিলির সেই চিঠিখানা বা'র করে চারুকে দিয়ে বললুম, এতেই তুমি বুঝতে পারবে কি প্রকার অবস্থায় তারা আছে।

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত চারু পড়ল। তারপর আমার দিকে সে শান্ত চক্ষে তাকাল। তারপর বলল, তুমি কেন নিজের কাছে ওদের রাখলে না, দাদু?

ওরা কেমন করে থাকবে? দুই বিয়ে এখন আইনে নিষিদ্ধ। ওরা তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

তোমার ওখানে থাকলে ধরিয়ে দিচ্ছে কে?

বললুম, ওদের শত্রুর অভাব নেই চারু। তোমাকেও যদি ওরা শত্রু মনে করে অবাক হয়ো না।

চারু বলল, তা বলে পালিয়ে বেড়াবে কতদিন বলত? শুধু তাই নয়, নাম ধাম লুকিয়ে এভাবে কতদিন চলতে পারে? এর থেকে আরও কত বিপদ আসতে পারে!

পারে বৈকি—আমি বললুম, সামাজিক দুর্নাম, পুলিশের পীড়ন,

কাজকর্ম না পাওয়া, সব জায়গায় তাড়া খেয়ে বেড়ানো,—এর থেকে কোনদিন ওদের মুক্তি নেই। ধরা পড়ে যদি শাস্তি হয়,—এবং শাস্তি হবেই,—তাহলে অমন একটা ভদ্র উচ্চশিক্ষিত ছেলের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার।

চারু বলল, আমি কি ওদের কোনও সাহায্যে আসতে পারিনে? একদিন ত' আমি সেই তোমার বাড়িতে বসে ওদের কথা দিয়েছিলুম, দাদু!

তুমি কি সাহায্য করতে পারবে ভাবছ?

চারু বলল, মিলিদির চিঠি পড়ে যা মনে হচ্ছে, ওঁদের দরকার এখন নিরাপদ আশ্রয়, নিয়মিত উপার্জন, এবং গোছানো ঘরকন্না। এর মধ্যে কোন্‌টা আমার পক্ষে সহজসাধ্য, তুমি বল?

আমি চুপ করে ভাবছিলুম।

চারু বলল, তুমি যদি সম্মতি দাও, কালই আমি মোটামুটি কিছু টাকা মিলিদির নামে পাঠাতে পারি—

না না—আমি বললুম, ওদের আমি জানি। ওরা কখনও কারো অনুগ্রহ নেবে না। মরবে, কিন্তু মর্যাদা ছাড়বে না! আমি কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছিলুম ভয়ে ভয়ে আশীর্বাদীস্বরূপ। তোমার কাছে যখন তার উল্লেখ করেছে, মনে হচ্ছে—আমার ওপর রাগ করেনি। চারু, আমি একদিন পিসির সম্পত্তি একপ্রকার কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। আজ আমার সত্তর বছর বয়স হতে চলল,—আর কদ্দিন? সুতরাং আমার সামান্য যা কিছু আছে ওদের যদি দিয়ে যাই, বাধা দেয় কে? —কিন্তু আমি জানি ওরা কী কঠিন দুঃখব্রতী! অপরের কোনও কিছু ওরা স্পর্শমাত্র করবে না!

চিন্তিত কণ্ঠে চারু বলল, তা হলে আমি কি করতে পারি তুমি বল?

জানিনে ভাই—আমি বললুম, আমার নিজের সময় হয়ে এল

পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার। তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা রেখে চলে যেতে চাই। চেয়ে দেখছি এবার আসছে বিরাট সমাজমনের বিপ্লব! আসছে সাংঘাতিক ভাঙ্গন। চলতি কালের নিয়মনীতি আইন-কানুন শাস্ত্র সংস্কার—সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই ভাঙ্গনের ঢেউ। জাতিবর্ণ শ্রেণী সম্প্রদায়—সমস্ত লণ্ডভণ্ড হবার সময় হয়ে এল। একদিকে শাস্ত্রধর্মের নির্দেশ, চিরাচরিত সংস্কার,—অন্যদিকে মানবতার ডাক, চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতা! আমি হয়ত এই সংগ্রামের শেষ পরিণতি দেখে যেতে পারব না!

বাইরে মাঠের সেই আটচালা থেকে পালাগানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। জানালার বাইরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অপরাহ্ণ আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় মলিন হয়ে এসেছে। আকাশে বর্ণসমারোহ ফুটেছে। এবার আমি ফিরব।

দাদু?

কেন ভাই?

চারু বলল, সব কথাই ত' হল, কিন্তু তুমি বা আমি ওদের জন্য এখনই কি করতে পারি তার সিদ্ধান্ত কিছু হল না ত?

বললুম, আমাকে যদি ওরা কিছু লেখে তোমাকে জানাব। তবে এটি নিশ্চয় জানি, সাহায্য বলতে আমি যা বুঝি তা ওরা কোনমতেই চাইবে না। ওরা অন্য ধাতে গড়া।

চৌকি ছেড়ে এবার আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম। চারুলতা বলল, তাহলে তুমিও জেনে রাখ, ওরা যখন যা লেখে তোমায় জানাব! তবে আমার একটা ধারণা তোমায় ব'লে রাখি দাদু! মিলিদি আমাকে বোধ হয় ঠিক সতীনের চোখে দেখবে না! সে বিশ্বাস করে আমি ওদের জীবনে কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। অন্তত তার স্বামীর ব্যাপারে যে আমি সম্পূর্ণ নির্বিকার একথা সে জানে! যদি কখনও সে দরকার মনে করে আমাকে ঠিকই জানাবে।

হাসিমুখে বললুম, শেষের দিকটায় বড় গাম্ভীর্য এসে গেল রে। আমার ওখানে কবে যাচ্ছিস বল্‌?

চারু বলল, যেদিন তোমার পায়ে আমাকে ঠাঁই দেবে?

বটে!—আমি বললুম, মামলার ভয়ে একজন নাম পালটালো। এবার আমাকেও বুঝি তুই বাপের নাম পালটাতে বলিস?

চারুলতা তৎক্ষণাৎ খিলখিল ক'রে হাসতে লাগল। আমি ওদের এ-মহল থেকে ও-মহল পেরিয়ে যাবার সময় বললুম, এবার গেলে কিন্তু একদিন আমার ওখানে থেকে আসতে হবে, চারু?

ও-মা, কি বলছ তুমি, দাদু?—চোখ কপালে তুলে চারু হেসে বলল, মাত্র একদিন? আমি ভাবলুম, এবার গেলে চিরদিনের জন্যে ঠাঁই পেয়ে যাব। কী পাষাণ প্রাণ তুমি?

এবার আমি উচ্চরোলে হেসে উঠলুম।

ট্যাক্সিখানা সেই মধ্যাহ্নকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারুলতা ড্রাইভারকে খাইয়ে দিয়েছে শুনলুম। বড় বেহাই, হরিমোহন, বেয়ান, শ্রীমতী পুষ্পলতা,—একে একে সবাই এসে দাঁড়ালো।

চারুলতা অদূরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঘোমটা টেনে সলাজনম্রা কনে বৌয়ের মতো মিষ্টি হাসি হাসছিল। আমি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলুম।

মেয়েটা কম দুষ্টু নয়!

॥ ৬ ॥

শ্রীমতী সুরমা দেবীর শেষ পরিণাম কি প্রকার দাঁড়াতে পারে এই নিয়ে আমি একটি ছক কেটে রেখেছিলুম। তাঁর ধারণা, প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তিনি নানা শারীরিক ব্যাধি বিকারে অসুস্থ। শুনতে পেলুম অনেক বিচিত্র এবং বিদেশী রোগের নাম, এবং তারও চেয়ে বিচিত্র কয়েকটি ঔষধের নাম তাঁর কণ্ঠস্থ। ইংরেজি ভাষা তাঁর জানা নেই, এবং বিদেশী ভাষায় বিভিন্ন ব্যাধি, উপসর্গ, চিকিৎসা এবং ঔষধাদির নামোচ্চারণ করাটাও তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক। কিন্তু রিজেণ্ট পার্কের ওই বাগানবাড়ি থেকে তিনি যখন ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে সুসজ্জিত ও প্রসাধন পারিপাট্যসহ নিজের গাড়িতে ওঠেন, তখন এই সংবাদটি লোকসমাজে প্রচলিত থাকলে চলবে না যে, তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত মহিলা নন। অবশ্য এটি তিনি সর্বত্রই দেখে এসেছেন, পোশাক ও প্রসাধনের সঙ্গেই পরিচয় মেলানো থাকে। লোকে তাঁকে দেখে ধরেই নেয় তিনি উচ্চশিক্ষিতা নারী। অতিশয় লেখাপড়া জানা সমাজে হঠাৎ গিয়ে প'ড়ে তিনি যখন বিব্রতভাবে চুপ করে থাকতে বাধ্য হন, তখন উপস্থিত সকলে এইটিই ধারণা করে নেয়, তিনি বিশেষ সংযত, শান্ত এবং স্বল্পভাষিণী!

এই সব নানাবিধ কারণে তরুণ ডাক্তারটিকে তিনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন। ডাক্তারটি ইউরোপ ফেরৎ, মিষ্টভাষী, সুশ্রী, এবং যে কোনও রোগীর প্রতি যত্নশীল। বয়স বোধহয় বছর তিরিশ, কিংবা তারও কম। নাম ডক্টর সেন, কিন্তু মাস ছয়েক রিজেণ্ট পার্কে আনাগোনা করার ফলে সুরমা দেবী তাকে স্নেহবশত জিতু ডাক্তার বলে ডাকেন। কখনো বলেন জিতু, কখনও ডাকেন শুধু ডাক্তার। অসুখ বিসুখ, উপসর্গ এবং ঔষধপত্রাদির নাম তিনি জিতু ডাক্তারের

কাছেই সংগ্রহ করেছিলেন। আমি শুনলুম ডক্টর সেনের নতুন চেম্বার এবং টেলিফোন আনার ব্যয়ভার সুরমা দেবী নিজেই বহন করেছেন। শুধু তাই নয়, জিতু ডাক্তার এখানে ওখানে যখন রোগী দেখতে যান, সুরমা দেবীর গাড়িখানাই তিনি ব্যবহার করেন। সম্ভবত এই নিয়ে সুরমার দুই ভাই রবিন এবং সতীশের সঙ্গে কিছু বচসা হয়, এবং তার ফলাফল স্বরূপ শ্রীমতী অনিমাকে ওরা পিসিমার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

নিত্য অসুস্থ বোধ করা, উপযুক্ত চিকিৎসা লাভের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ, ঔষধ সেবনের প্রতি অবিশ্রান্ত আগ্রহ—এগুলি আরেক ধরণের ব্যাধির লক্ষণ কিনা—এ আমি জানিনে। তবে এটি অনেকবার আমার কানে এসেছে, ডক্টর সেনের আসা-যাওয়ার প্রারম্ভ থেকে সুরমা দেবী কোন সময়েই সুস্থ হয়ে ওঠেননি। এমন কি ডক্টর সেনও অনেকবার একথা বলেছেন, মিসেস চ্যাটার্জি, ঘুমের ওষুধ আপনার প্রত্যেক দিন খাবার দরকার নেই। আপনি কতকগুলি নিয়ম পালন করে চলুন, ঘুম ঠিকই হবে।

সুরমা দেবীর পক্ষে নির্মল বায়ু সেবনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁর নার্ভ-কনডিশন এরূপ যে, কেবলমাত্র ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে বায়ু-সেবন মানসে একা ময়দানে ঘুরে আসা—এতে তিনি ভয় পান। সেই কারণে ডাক্তারকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হয়। ডাক্তার যদি কোনও প্রয়োজনে অনুপস্থিত থাকে, তবে সুরমা দেবী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে নাকি বলেন, রোগীর প্রতি তুমি আরেকটু মনোযোগী হলে ভাল হয়, জিতু। তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমার হার্টের অবস্থা ভাল নয়। বিশেষ করে অনিমার চলে যাওয়ার পর থেকে আমার নার্ভাস ডেবিলিটি আরও বেড়েছে। আমি ন্যুরটিক্, তুমি জান!

ডাক্তার একটু লাজুক প্রকৃতির। সে শুধু মৃদু হাস্যে বলে, আমার একটা পার্টি ছিল কিনা!

পার্টি! আবার সেই পার্টি! সুরমা দেবীর যেন কান্না পেয়ে যায়,—তোমাকে না বলেছি ডাক্তার, অত পার্টিতে আনাগোনা করা ভাল নয়। ওতে নানা কথা রটে। তা ছাড়া তুমি আজও অবিবাহিত—

ডাক্তার আর কিছু বলে না। শুধু মেজার গ্লাসে কি যেন একটি তরল ঔষধ ঢেলে সুরমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুরমা দেবী সেটি তখনই গলাধঃকরণ করে একটু হাসেন। বলেন, আচ্ছা ডাক্তার, আমি যে সেই কথায়-কথায় টেম্পার রাখতে পারতুম না, সেটা বোধহয় তোমার ওই শেষ ওষুধে কমেছে! কি বল?

মিষ্টি হেসে ডাক্তার শুধু বলে, বোধহয়!

সুরমা দেবী কিছুক্ষণ একপ্রকার অদ্ভুত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর হঠাৎ বলেন, নাঃ তুমি সেই লাজুকই রয়ে গেলে জিতু, কুণ্ঠা-সঙ্কোচ তোমার কাটল না। মিথ্যেই তোমার বিলেতি ডিগ্রী!—এই বলে তিনি পাশ ফিরে শো'ন।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে ঘরের এখানে ওখানে কি যেন সব গুছিয়ে রাখে। তারপর এক সময় গলাটা পরিষ্কার করে বলে, দিনের বেলায় আপনি ওই ড্রাগটা আর খাবেন না মিসেস চ্যাটার্জি। সন্ধ্যেবেলা যদি দরকার হয় আমি এসে সেই ইন্‌জেকশনটা বরং দেবো।

তোমার খুশি।—ওপাশ ফিরেই সুরমা দেবী জবাব দেন।

ডাক্তার ঈষৎ হাসি মুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়।

এইসব ছোটখাটো সংবাদ শুনে আমি যখন কৌতুকবোধ করছি, সেই সময় কে যেন কোথা থেকে খবর দিয়ে গেল, দক্ষিণ কলকাতার কোনও একটি নামজাদা হাসপাতালে মাঝে মাঝে জিতু ডাক্তার সুরমাকে নিয়ে যায় চেক-আপ করাবার জন্য। সেখানে প্রায়ই গিয়ে যেহেতু তাঁকে তিন চারদিন করে থেকে আসতেই হয় সেজন্য সুরমা

নাকি সেই হাসপাতালে একটি চেম্বার স্থায়িভাবে ভাড়া নিয়েছেন। সুরমা দেবী তাঁর টাকাকড়ি চিরকাল সঞ্চয় করে রাখবেন কার জন্য ?—এ প্রশ্ন তাঁর মনে এসেছে বৈ কি। বরং তাঁর নিজের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই কিছু খরচ হোক না কেন ? এই ত জিতু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি দিন পনেরোর জন্য তিনি সফেন সমুদ্র তীরবর্তী গোপালপুরে গিয়ে সেই মেমসাহেবটির হোটেলে বাস করে এলেন। টাকা থাকলেই কিছু আর হয় না, টাকা খরচ করারও আবার একটা আর্ট আছে, সবাই কি সেটি জানে ? তাঁকে যদি চিকিৎসাদির জন্য ভিয়েনা যেতেই হয়, তাহলে তিনি যে কেবলমাত্র ভিয়েনাতেই থাকতে যাবেন না, একথা নাবালকেও বোঝে। ডক্টর সেন বলেছে, লণ্ডন আপনার ভাল লাগবে না। বড্ড বাঁধাবাঁধি। প্যারিস-ই আপনি বেশি পছন্দ করবেন।

সুরমা নাকি ডাক্তারের কাছে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন, তাঁরা সমুদ্র পথেই যাবেন। ভাল জাহাজে ফার্স্ট ক্লাস ক্যাবিন ও বারান্দা চাই। অনেক দিন ধরে সমুদ্রের ওপর ভাসমান থাকা, সেইটিই স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রের হাওয়া আর ঢেউয়ের পর ঢেউ, হৃদরোগের পক্ষে এগুলো ভাল। আমারও বিশ্বাস, ইউরোপ-আমেরিকার জলহাওয়াই সুরমার প্রাণ ধারণের উপযুক্ত।

সে যাই হোক, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে ধর্মকর্মের প্রতি মন বসাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গড়গড়ায় তামাক খাবার সদভ্যাস করব কিনা ভাবছিলুম, এমন সময় একদিন হঠাৎ সুরমা দেবীর গাড়িখানা এসে আমার দরজায় লাগল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে নেমে সটান এসে আমার ঘরে ঢুকলেন।

আমি একখানা ইংরেজি বেদান্তভাষ্য সামনে খুলে রেখে তামাকের কথাই ভাবছিলুম। মুখ তুলে বললুম, আরে, এসো এসো। একা যে ?

একা নয়ত কি—সুরমা দেবী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, সঙ্গে কেউ থাকলে তামাশায় তোমার মুখ চুলবুল করে উঠবে যে! হ্যাঁ, এই অসুস্থ শরীরে আমি একাই এসেছি! আমার কথার জবাব দাও!

আমি বললুম, অসুস্থ বলছ, কিন্তু তোমার ওজন বেড়েছে দেখে মনে হচ্ছে যেন?

সুরমা বললেন, কেন বাড়বে না? শরীরে কি এক ফোঁটা রক্ত আছে যে, ছিমছাম চেহারায় থাকব? সমস্ত চর্বি, আগাগোড়া সব চর্বি! আমি যে এ্যানিমিয়ায় ভুগছি, তুমি তার কতটুকু খবর রাখো? তুমি ত আর ডাক্তার নও!

বটেই ত!—আমি বললুম, কিন্তু চর্বি বাড়লে কি চোখের কোণে অমন কালি পড়ে?

পড়ে না? রাত হলেই যে ভয়! এতটুকু ঘুম নেই! এখন যেন আর কোনও ওষুধেই ঘুম আসতে চায় না! এত ইন্‌জেকশন নিচ্ছি—

আহারাদির ব্যাপারটা?—প্রশ্ন করলুম।

ছাই।—সুরমা দেবী জ্বলে উঠলেন,—ছাই আর পাঁশ! জিতু ডাক্তার কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে বলে, আপনাদের এই ব্যাক-ওয়র্ড দেশে ডায়েট আর কি দেবো বলুন! আপনি আবার ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। হ্যাঁ, বটেই ত! এদেশে নাকি পুরুষরা মরে মেয়েদের পাপে! আমরা বিধবা হয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি! স্বামী! স্বামী বেঁচে থেকেও কাছে রইল না, আবার মরে গিয়েও উপোস করিয়ে রাখল। কপালে আগুন পুরুষের!

আমি হাস্যমুখে সুরমা দেবীর চিত্ত-বিক্ষোভ লক্ষ্য করেছিলুম। তাঁর দুই চোখের তলাকার কালিমা ঘন পাউডারের প্রলেপেও ঢাকা পড়েনি।

অতঃপর সুরমা দেবী বললেন, আসতুম না তোমার কাছে।

তোমার মুখ দেখতেও আমার ইচ্ছে ছিল না। তবু এলুম তোমার সঙ্গে শেষবারের মতন খোলাখুলি কথা কইতে। আমার কাছে কোনদিন তুমি মন খুলে কথা বলনি। আজ সত্যি বল।

হাসিমুখে বললুম, তোমার কথা শুনে আমার হার্টের কন্‌ডিশন্ খারাপ হচ্ছে। তোমার সেই তরুণ ডাক্তারকে সঙ্গে আনলে ভাল করতে।

তামাশা রাখ।—সুরমা গলা উঁচু করলেন,—তুমি বাড়িতে বসে চিরকাল আমাদের ফ্যামিলির কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়েছ। তোমার মরবার বয়স হল, তবু একে একে সব ছেলেমেয়েকে আস্কারা দিয়ে তুমি তাদের স্বভাব চরিত্র নষ্ট করেছ।

বললুম, তারপর?

তুমি আমার সংসারে একদিন আগুন জ্বালিয়েছ, ভুলে যেয়ো না। —সুরমা দেবী গরম হয়ে বললেন, তোমার জন্যে কোনওদিন স্বামীর সঙ্গে আমার মনোমালিন্য মেটেনি! তোমার জন্যে ছেলে হারালুম, বউ হারালুম, আজ মেয়ে-জামাইকেও তোমার জন্যে হারাতে বসলুম!

চমকে উঠে বললুম, সে কি? শুভা আর হিরণ্ময়ের কথা বলছ? কি হয়েছে তাদের?

ভগ্নকণ্ঠে সুরমা দেবী এক প্রকার কেঁদে উঠলেন। বললেন, হিরন্ময়রা জলপাইগুড়িতে চা-বাগানের মালিক। সেখানে তাদের সামাজিক সম্মান,—সুনাম,—তারা সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাদের মাথা হেঁট হয়েছে মিলি আর সোমেনের জন্যে। যেমন কেচ্ছা, তেমনি কেলেঙ্কারী! শেষ পর্যন্ত সেখানে ওদের ঢলাঢলি দেখে পাড়ার লোকেরা মারমুখী হয়। হবেই ত! লোকের চোখে অনাচার বরদাস্ত হবে কেন?

বেশ, বুঝলুম।—আমি বললুম, তোমার ছেলে অনাচার করেছে

জলপাইগুড়িতে। আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে আক্রমণ করতে এলে কেন ?

সুরমা বললেন, করব না ? তুমিই ওদেরকে আস্কারা দিয়েছ ! তুমিই যত নষ্টের গোড়া।

আমি এবার হাসলুম। বললুম, মাথা ঠাণ্ডা করো সুরমা। ধরো, এই তুমি আমি এখানে বসে আছি—এখন যদি হঠাৎ চারুলতা এসে ঘরে ঢুকে আমাকে এই বলে আক্রমণ করে, তোমার সাংঘাতিক আস্কারা আছে বলেই রিজেণ্ট পার্কের বাড়িতে আমার শাশুড়ী একটু বেহায়াপনায় মেতে আছেন, এবং ওখানে এক তরুণ ডাক্তারকে তুমিই আড়াল থেকে উস্‌কিয়ে দিচ্ছ, - তার উত্তরে আমি তোমার পুত্রবধূকে কি বলতে পারি বল !

সুরমা দেবী একটু নরম হয়ে এবার বললেন, এসব অদ্ভুত কথা তোমার মনে আসে কেন ? একটা কল্পনা, অন্যটা ঘটনা—এ দুটো কি এক হল ?

আমি বললুম, শোনো সুরমা—কিছু মনে করো না। তোমার নিজের অদ্ভুত চেহারাটা তোমার চোখে পড়ে না—এই দুঃখ। আমি সম্পর্কে তোমার দাদামশাই, সেই সুবাদে তুমি নাতনী। কোলে পিঠে করে তোমাকে মানুষ করেছি। তোমার বাপের বিয়ের আগে আমাকেই কনে পছন্দ করতে পাঠানো হয়েছিল। তোমার বিয়ে আমিই দিই, তখন তোমার বাবা সামান্য অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করত। যুদ্ধের সময় আমারই কাছে টাকা ধার নিয়ে তোমার বাবা মিলিটারি কনট্রাক্ট-এ মাল সাপ্লাই করে। আজ কি দেখছি ? নিজের দোষে তুমি স্বামীকে দূরে সরিয়েছিলে ! জিদের বশে ছেলেকে পর করেছিলে ! মিলিকে নিয়ে নোংরা চক্রান্তে নেমেছিলে ! আজ নিজের বাড়িতে কি ধরণের জীবন যাপন করছ ? এটা কি খুব সম্মানের হচ্ছে ? এটা কি তোমার মেয়ে জামাই বরদাস্ত করতে পারবে ?

সুরমা দেবী একটু চাঞ্চল্য বোধ করছিলেন, এবং আমার মনে হল তিনি আমার কথায় কান দেবার দরকার মনে করেন না! এক সময় তেমনি উত্তেজিত হয়েই তিনি বললেন, গোড়ার কথাটা কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে দিয়ো না। মিলি আর সোমেন জলপাইগুড়িতে থাকা অবস্থায় বেআইনী বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল! সবাই জানে এই অসবর্ণ বিয়েতে তোমার আস্কারা আর উৎসাহ ছিল!

দাঁড়াও—আমি এবার বললুম, একদিন তুমি নিজে চারুলতার সঙ্গে সোমেনের সবর্ণ বিয়েতে বাধা ঘটিয়েছিলে! কেননা মিলিকে তুমি তখন পুত্রবধূ করতে চেয়েছিলে!

আমি কি এক বিয়ে থাকতে আরেক বিয়ে দিয়েছিলুম? কেন তুমি বাজে তর্কে আমাকে নামাচ্ছ? নতুন আইন তুমি জান না? নাম ভাঁড়িয়ে দুবার বিয়ে করলে শাস্তি নেই? দেশে থানা-পুলিশ মামলা মোকদ্দমা নেই? তুমি কি ভেবেছ এবার আমি চুপ করে থাকব?

আমি হাসলুম,—ছেলের ওপর এমন প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠলে কেন তুমি, সুরমা?

সুরমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থানা-পুলিশে যদি জানাজানি হয় তুমিও বুড়ো বলে রেহাই পাবে না, বলে গেলুম। আমি খবর পেয়েছি বর্ধমান থেকে,—জানি তারা কোথায় কি ভাবে লুকিয়ে আছে! অল্পে আমি ছাড়ব না এবার, মনে রেখ।

সুরমা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, ছেলে! ছেলে যদি মা-বাপের সম্মান না রাখে, তবে সেই ছেলে পরম শত্তুর।

বললুম, তুমি কি সন্তানের কাছে নিজের সম্মান রাখতে পারলে, সুরমা?

এইটি তোমার অজুহাত, আর এই অজুহাত নিয়ে তুমি আজ

আমার স্বভাব চরিত্রের দুর্নাম রটাচ্ছ! তোমাকেও আর বিশ্বাস করিনে।

সুরমা দেবী তীরবেগে বেরিয়ে চলে গেলেন।

মনের কথাটা বলি। সুরমা দেবীর চেহারা দেখে এই প্রথম আমি ভয় পেয়েছিলুম। তাঁর আক্রোশের জন্ম হচ্ছে নৈরাশ্যপীড়ন এবং অতৃপ্ত বাসনার থেকে। তাঁর যা দরকার ছিল তা তিনি যৌবনকালে পাননি।

নরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেদিন একপ্রকার ঘুচল, তখন আমার যতদূর মনে পড়ে—সুরমার বয়স একুশ বাইশ। কোলের বাচ্চা মেয়েটির বয়স মাস ছয়েক, ছেলেটির বয়স বছর দুই। দু' বছরের ছেলেটিকে স্বামীর কাছে ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে তিনি জব্দ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, শিশুপালনে অক্ষম হয়ে স্বামী তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করবেন। কিন্তু তা হয়নি। বরং নরেশচন্দ্র শিশুটিকে অযত্নের মধ্যেই ছেড়ে দিলেন, এবং সেই শিশু যেমন তেমনভাবে প্রৌঢ়া বিধবা পিসির কাছে মানুষ হতে লাগল। সুরমা সেই সময় এক আধবার আসতেন স্বামীর হায়রানি এবং শূন্য ঘরকন্নার দারিদ্র্য দশাটা দেখে যাবার জন্য। তাঁর তখনকার সাজসজ্জা, ধরণ ধারণ এবং ওই ছেলেটির ভবিষ্যৎ হিতাহিত সম্বন্ধে তাঁর ঔদাসীন্য—এগুলি কারও চোখেই ভাল ঠেকত না। তিনি সেদিন যে শুধু স্বামীকেই হারাচ্ছিলেন তাই নয়, আত্মপরতা এবং আত্মাভিমানের অন্ধতায় ছেলেটিকেও যে হারাতে আরম্ভ করলেন সেটি তাঁর চোখে পড়ল না।

সেই অন্ধযুগে শ্রীমতী সুরমা বুঝতে পারেননি যে, তিনি নিজেকে তাঁর এই ভরা যৌবনকালে কি কি বিষয়ে বঞ্চিত করে রাখছেন। একথা তাঁকে কেউ বলে দেয়নি, নিরভিমান সংযমের সৎশিক্ষা যদি না তাঁর থাকে তবে পরবর্তীকালে অনুকূল অবস্থা পেলে দেহ-প্রকৃতি তার পূর্ণ মূল্য আদায় করে প্রতিশোধে! আজ দুর্ভাগ্যবতী সুরমার জীবনে

সেই কাল উপস্থিত। আজ তাঁর ভিতর থেকে প্রকৃতি আপন বীভৎসা চেহারা নিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে! আক্রোশ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, বাসনা, ক্ষুধা, প্রতিহিংসা—এরা যেন সহস্র ফণা ধরে তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি ভয় পাচ্ছি সুরমার পরিণাম ভেবে। ভয় পাচ্ছি তাঁর রিজেণ্ট পার্কের জীবনযাত্রার চেহারা বিশ্লেষণ করে। আমার বিশ্বাস, ঘোরতর অশিক্ষা এবং অজ্ঞান তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

আমার ধারনা হয়েছিল, সুরমা দেবী সোমেন্দ্রর বিরুদ্ধে একটা অসামাজিক এবং অস্বাভাবিক এমন কিছু করে বসবেন যার জন্য সকলের মাথাই হয়ত হেঁট হবে। সেই দুর্ভাবনা নিয়েই কয়েকদিন আগে আমি মিলির কাছে একখানা জরুরী চিঠি লিখেছিলুম। আমি ওদেরকে একটু সতর্ক না করে পারলুম না।

কিন্তু তবু চুপচাপ বসে থাকতে আমি একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছিলুম। ভাবলুম, একখানা চিঠি দিয়ে আমি নির্লজ্জের মতো একবার সুরমাকে ডেকে পাঠাই। জানি, আমার চিঠি পেলে উনি ঠিকই আসবেন। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পাছে আমার পাচক ব্রাহ্মণের মুখের ওপর সুরমা কুদৃশ্যের অবতারণা করেন,এই আশঙ্কাও ছিল আমার। সুতরাং আমি নিজেই একদিন সকালে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যাওয়া মিথ্যে হল। রিজেণ্ট পার্কের বাড়ির আধমরা গোলাপ-বাগান পেরিয়ে যখন দোতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠলুম, ঝি বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলল, আ কপাল! বুড়োদাদু! ছ'মাস পরে বুঝি সব নাতি-নাতনীদের মনে পড়ল? আসুন—আসুন—। দিদিমণি নেই ত।

বললুম, কোথায় আবার গেলেন তিনি?

উনি গাড়ি নিয়ে গেছেন বর্ধমানে কি যেন কাজে! সঙ্গে গিয়েছে বাহাদুর,—সেই যে নতুন নেপালি চাকরটা!

আমি চমকে উঠলুম। আমার আশঙ্কা বোধ হয় মিথ্যা নয়। তবু বললুম, কি জন্যে হঠাৎ বর্ধমানে গেলেন, জান ফুলমণি ?

ফুলমণি এদিক ওদিক তাকাল। কেউ কোনদিকে নেই, তবু সে গলা নামিয়ে বলল, এ বাড়ির সব কাণ্ডই আলাদা, বুড়োদাদু। ছেলে যে লুকিয়ে কায়েতের মেয়েকে বিয়ে করেছে, সে কি আর দিদিমণি জানতেন ? মিলি এখন জেঁকে বসেছে গদি আঁকড়ে।

তারপর ?

কি জানি, বুড়োদাদু! জিতু ডাক্তার নাকি বলছে, আজকাল সতীন নিয়ে ঘরকন্নার আইন আর নেই! তা হবে, দিনে দিনে কতই শুনব! এইজন্যেই চারদিকে এত হাহাকার!

আমি বললুম, জিতু ডাক্তারের সঙ্গে আমার একবার দেখা হলে ভাল হত। তার ঠিকানা জান তোমরা, ফুলমণি ?

কই না ত'!—ফুলমণি বলল, এই ত ফিরে এলেই দেখা হবে! জিতু ডাক্তারই ত' দিদিমণির গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে!

থমকিয়ে গেলুম। তাহলে ড্রাইভারটি তাঁর নায়িকায়ে পাশে বসিয়েই আনন্দ-যাত্রায় বেরিয়েছেন! ফুলমণির দিকে চেয়ে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সুরমা দেবীর জীবনের জটিল অঙ্কটা মনে মনে একবার কষে নিলুম। তারপর বললুম, দিদিমণি এলে বলো আমি এখানকার খোঁজখবর নিতে এসেছিলুম।

ফুলমণি গড় হয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করে বলল, যে আজ্ঞে।

আমি নেমে গিয়ে বাগান পেরিয়ে আবার পথ ধরলুম। আশার বিরুদ্ধে আশা পোষণ করছিলুম, সুরমা দেবী উত্তেজনা ও আক্রোশ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকবেন। জননী হয়ে তিনি সন্তানের বিরুদ্ধে ঠিক এভাবে অভিযান করবেন, এটি আমি ভাবিনি। মেয়েদের জীবনে বাৎসল্য এবং মাতৃস্নেহ নাকি সর্বাপেক্ষা মহিমাময়—জীবন-সায়াহ্নে

এই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে-বিশ্বাস যেন হারালুম। আমার পক্ষে এখন ঠিক কি করা উচিত, কিছু ঠাহর করতে না পেরে পথে-পথেই ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়ালুম।

শ্রাবণের আকাশ দক্ষিণ দিগন্তে ঘন হয়ে উঠেছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এসে ট্রামে উঠলুম।

অনেক অপ্রত্যাশিতের সাক্ষাৎ অনেকবার ঘটেছে এ জীবনে, কিন্তু আজকের একটি আকস্মিক বিস্ময়াঘাত আগের সবগুলোকেই যেন ছাড়িয়ে গেল। কেননা অন্যমনস্কভাবে বাড়িতে এসে ঢুকেই সামনে দেখি চারুলতা— ! আমাকে দেখে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

অবাক বিস্ময়ে বললুম, এ কি ? তুই ?

বাঃ এর মধ্যেই সব চুক্তি ভুলে গেলে, দাদু ? আমি যে তোমার সঙ্গে ঘরকন্না করতে এলুম ?

এতক্ষণে আমার পোড়ারমুখে হাসি বেরলো। বললুম, বটে ? অবিনাশ রায়কে চেনো না! এমন ঘরকন্না আরম্ভ করে দেব যে, ছেড়ে যেতে মন উঠবে না!

তেমনি মধুর এবং তেমনি উল্লোল হাসি চারিদিক ছড়িয়ে আমার কোমরের দিকে হাতখানা জড়িয়ে চারুলতা বলল, অমন করে বাঁকা চোখে তাকিয়ো না, লক্ষ্মীটি—শরীর কেমন করে! পুরনো পুরুষের ভেতর থেকে সোঁদরবনের বুড়ো বাঘ না বেরিয়ে আসে!

আমিও এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলুম। তারপর বললুম, কখন এসেছিস ভাই ?

ওমা, সেই কখন! এসেই শুনি তুমি একটু আগে বেরিয়েছ!

—গলগলিয়ে হেসে চারু পুনরায় বলল, ভাবলুম পোড়া কপাল বোধ হয় আবার পুড়ল! কোন্ সর্বনাশী হয়ত তোমাকে চোখ মট্‌কে ভোরবেলায় ডেকে নিয়ে গেছে!

প্রায় ঠিক ধরেছিস। শুধু একটু শুধরে দিই! এক সর্বনাশীর পেছনেই সকালবেলা ছুটেছিলুম!

বুঝেছি!—চারুলতা বলল, শুনব সব তোমার কাছে। একটু দাঁড়াও, আসছি আমি।

বলতে বলতে চারু আমার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। আমি তার পিছনে পিছনে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালুম। দেখি আমার ঠাকুর রাধাচরণ একপাশে বসে শিলনোড়ায় মসলা পিষছে।

নুন-হলুদমাখা রুইমাছগুলি একে একে তেলের কড়াইয়ে ছাড়তে ছাড়তে হাসিমুখে চারুলতা বলল, তোমার বাড়ি এসেই সকলের আগে রান্নাঘর দখল করেছি, দাদু। ভয় পেয়ো না, আমি বামুনের মেয়ে!

হা-হা-হা করে আমি আবার হেসে উঠলুম।

পোড়ারমুখি আজ আবার এনেছে মাছ, দই, মিষ্টি, বাতাবি লেবু, কয়েকটা নারকেল, একটা চাল-কুমড়ো, মস্ত এক মোচা ইত্যাদি। এ বাজারে এগুলি কুটুম্বমহল থেকে বিনামূল্যে পাওয়া গেলে গৃহস্থ-মাত্রেরই চিত্ত পুলকিত হয়। কিন্তু আমি যে সত্তর বছর বয়স পর্যন্তও গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারলুম না, এটি চারুকে বোঝানো কঠিন। সে যাই হোক, আজ আমি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং নৈরাশ্যপীড়িত ছিলুম। আমার মনে হল, অমরাবতীর অমৃতলোক থেকে পরম কল্যাণীর মূর্তি নিয়ে যেন নেমে এসেছে চারুলতা।

রান্নাবান্নার মাঝখানে একবারটি সে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। বলল, অনেক কথা আছে দাদু, সব বলব। আগে তুমি স্নান করে এসো, তোমার পাদ্য অর্ঘ্য দিই!

এবার সকৌতুকে বললুম, আগাগোড়া তোর কাছে যেন বেকুব বনে যাচ্ছি রে! তুই ত' চট করে এখানে আসবার মেয়ে নয়? কাউকে সঙ্গে এনেছিস, না একা?

শোন' কথা!—চারুলতা হেসে গড়িয়ে গেল, একটু জ্ঞান বুদ্ধি তোমার হয়নি, দাদু! একা নয়ত কি? এ আর কতটুকু পথ? বৃন্দাবন থেকে মথুরা! তোমার নাম জপ করতে করতে এসেছি, পথের ভয় পথের দুপাশেই ত' পিছিয়ে যেতে লাগল!

আমি যেন এই প্রাণবন্যার সামনে একেবারে ভেসে গেলুম। থামবার পর চারুলতা এবার বলল, একা আসিনি দাদুভাই, আমাদের পুরনো দেউড়ির বুড়ো মোতি চাঁদ সঙ্গে এসেছে। দিদিকে নিয়ে সে গেছে আলমবাজারে, সেখানে আজ দিদির দেওরের বৌভাত। সন্ধ্যের পর এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ততক্ষণ আমাকে তোমার বাড়ির গিন্নি হয়ে থাকতে দাও, দাদু!

এবার চোখ পাকিয়ে হেসে বললুম, দেখ ছুঁড়ি, সত্তর বছর বয়স হলেও পুরুষের রক্ত, মনে রাখিস। তাতিয়ে তুলিসনে!

ঝড়ের মতো চারুলতা হেসে উঠল। তারপর কাছে এসে আমার মুখখানা নিরীক্ষণ ক'রে বলল, বুঝেছি! শূন্যপাত্র ঠনঠনিয়ে বেশি বাজে! নাতনীরা কাছে এলে এখনও ভয় পাও!

চারুলতা খিলখিলিয়ে আবার হেসে ছুটে পালাল।

অতঃপর পাচককে ছুটি দিয়ে নিজেই সে রান্নাবান্না করল। আমার জন্যে এনে দিল তেল সাবান তোয়ালে ইত্যাদি। ধুতিখানা ক্ষিপ্রহস্তে কুঁচিয়ে দিল এবং রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে জানাল, বড় দুঃখ রইল, তোমার তামাক খাবার অভ্যাস নেই। নইলে নিজেই আমি সেজে দিতুম!

আমি বললুম, বেশ ত, আমার মরণকালে এ ঘরের গৃহিনিত্বটা নিয়ে নে, দেখবি আরো কতরকমের অভ্যাস করে বসি!

স্নান সেরে খেতে এসে বসলুম। এবার চারুলতাকে বাগে পেয়েছিলুম। আমি শ্বশুরবাড়ির পক্ষ, সুবাদে দাদামশাই, এবং গুরুজন,—আমার সামনে খেতে বসা নাকি রীতিতে বাধে! এবার

চারু একেবারে কুণ্ঠায় ও লজ্জায় জড়োসড়ো। সে আসলে গ্রামের মেয়ে। এ ধরনের অভ্যাস তার এখনও হয়নি।

আমি তার হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে এনে আমার মুখোমুখি টেবিলে বসিয়ে ঠাকুরকে পরিবেষণ করতে বললুম। চারু বলল, তোমার সামনে খেয়ে যদি আমার পেট না ভরে, তাহলে তুমি দায়ী।—এই বলে সে হাসল।

আমিও ছাড়লুম না। বললুম, যদি লজ্জা করে খাস তাহলে বুঝব, তুই স্বামী ও শ্বশুরবাড়িকে মনে মনে স্বীকার করিস, এবং সোমেনের প্রতি তোর অনুরাগ নিবিড়।

আমার কথাটা কান পেতে শুনে চারুলতা হঠাৎ চুপ করে গেল।

ঠাকুর একে একে সমস্ত সামগ্রী এনে পরিবেষণ আরম্ভ করে দিল। সুন্দর ঝুরঝুরে ভাত, পোরের ভাজা, মুড়ি ঘণ্ট, মোচার তরকারি, মাছের কালিয়া ও ডিমে ডুবিয়ে ভেট্‌কি মাছ ভাজা, শুক্তো, আনারসের চাটনি,—বিভিন্ন দফায় টেবিল ভরে গেল।

অনুরাগ এবং সম্ভ্রমবোধের থেকে যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা এবং জড়তা আসে,—আমার এই মন্তব্যটি চারুলতার সেইখানে কোনও একটা জায়গায় গিয়ে স্পর্শ করেছিল। সে যেন তখন থেকে জুড়িয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ পরে এবার খেতে খেতেই একসময় সে বলল, দাদু, এসব কথা আমার মনে আসাও পাপ! আমি চাই আমার নির্বিকার নিরাসক্তি। সোমেনবাবু হলেন মিলিদির স্বামী! এর বিপরীত কোনও কথা যেন আমাকে কোনদিন পেয়ে না বসে। যদি সেই দুর্মতি আমার কোনওদিন আসে, তুমি আমাকে বাঁচিয়ো!

আমি বললুম, তুই তার শেষ চিঠিখানার জবাব কি আজও দিসনি?

চারুলতা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, না, দিইনি।

আমি চুপ.ক'রে খেয়ে যাচ্ছিলুম !

চারুলতা পুনরায় বলল, বুঝলে দাদু, আগে মনে করেছিলুম সে-চিঠি মামুলী। এক বন্ধু যেমন আরেক বন্ধুর কাছে সাধারণ চিঠি লেখে। এখন দেখছি সে-চিঠি নিতান্ত সাধারণ ছিল না। সেটি ভূমিকা মাত্র। আসল বক্তব্য তার পরেরটিতে।

কি রকম ?—আমি মুখ তুললুম, আবার কি সোমেন লিখেছে ?

হ্যাঁ !—খেতে খেতেই চারুলতা জবাব দিল, সেই চিঠিখানা সঙ্গে নিয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

কী আছে চিঠিতে রে ?

খেয়ে উঠে তুমি নিজেই দেখো। জরুরী চিঠি !

চাটনির প্লেটখানা এবার টেনে নিলুম। তারপর চিন্তিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, একটা কথা আমাকে ঠিক ক'রে বল্‌ত চারু, সোমেন মিলিকে বিয়ে করেছে একথা তোদের ওখানে জানাজানি হয়েছে ?

চারুলতা বলল, না, কেউই জানে না। সবাই জানে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন !

কিন্তু এই যে সব চিঠিপত্র আসে তোর নামে, পাড়াগাঁয়ে এ নিয়ে কানাকানি রটে না ?

এখনও রটেনি।—চারু বলল, আমাদের ইস্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, সূচী শিল্পালয়, প্রসূতি সদন, দাতব্য কেন্দ্র—এই সব নিয়ে রোজ দশ-বিশখানা চিঠি আসে। কোন্ চিঠি কার, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পোষ্ট আফিস আমাদেরই বাড়ির একপাশে। মাষ্টার মশাইরা আমাদেরই পুরনো কাছারিবাড়িতে থাকেন। তা ছাড়া পাঁচ বছর হয়ে গেল। আমার বিবাহিত জীবন নিয়ে চাপা দুঃখ মা-বাবার থাকতে পারে, কিন্তু বাইরের কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আমি প্রশ্ন করলুম, আরেকটা কথা বল্‌ত ? কিছুদিন আগে

নাকি সুরমা একা গিয়েছিলেন তোদের ওখানে? আমি তোকে ও-কথাটা জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গিয়েছিলুম।

চারু বলল, আমি ভুলিনি। কিন্তু সেটি একটি অপ্রিয় ঘটনা ব'লেই আমি তোমার কাছে উল্লেখ করিনি।

কি রকম?

সুরমা দেবীর উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে ভয় দেখানো। তিনি ভয় দেখিয়ে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন!—চারু বলল, আমি যে ভয় পাইনে এবং মনেপ্রাণে সোমেনবাবুকে মিলিদির স্বামী বলেই বিশ্বাস করি, এটি তিনি বুঝতে পারেন নি!

তারপর?

চারু এবার হেসে বলল, চল দাহু আগে আঁচিয়ে আসিগে। উনি শুধু শাশুড়ীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার বলবার কিছু থাকত না। কিন্তু উনি ভেবে চিন্তেই আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন আমার বাপের বাড়ির মুখে কলঙ্ক মাখিয়ে আসার জন্য!

হাত মুখ ধুয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, তোরা কি বললি?

এবার চারুলতা খুব হেসে উঠল। তারপর আঁচিয়ে এসে বলল, উনি প্রথমবার গিয়ে আমাকে সেই ঘোমটা টানা লজ্জা-জড়ানো কনে-বৌর চেহারায় দেখে এসেছিলেন। এবার গিয়ে দেখলেন, আমি ঘোমটা টেনে ফেলে ইস্কুলের মাষ্টারনিও হতে পারি! কলসীর কানা ছুঁড়ে কেউ আমার কপাল ফুটো করতে এলে আমি তার বদলে প্রেম নিবেদন করতে ছুটিনে! কিংবা একগালে চড় মারলে অন্য গালও পেতে দিইনে!—সেদিন ওঁকে প্রায় চোখের জল ফেলেই ফিরে আসতে হয়েছিল, দাহু!

এই প্রাণোচ্ছল কলহাস্যমুখরার মধ্যে যে ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা কঠিনহৃদয়া মেয়েটা বাস করে, আমি তার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম। আমার কালের যে পল্লীবালাদের প্রকৃতি আমার

জানা ছিল, তারা আজকে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। এ মেয়ে অন্য। ভবিষ্যতে এ মেয়ে ঠিক কেমন দাঁড়াবে, সেটি দেখে যেতে পারব না—এই দুঃখ।

সারাদিন এখানে থাকবে বলেই চারুলতা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। সঙ্গে এনেছে একটি হ্যাণ্ডব্যাগ। কিছু কিছু পরিচ্ছদ-প্রসাধন সামগ্রী আছে ওর মধ্যে। সেই হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে এবার সে একখানা চিঠি বার করে নিয়ে এল। সোজা এসে খামখানা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, দাদু এ চিঠি মন দিয়ে পড়। কিন্তু আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। পরে আমাকে ডেকো। আমার কি করা উচিত আমাকে বলে দিয়ো।

চারুলতা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল।

চিঠিখানার উপরে লেখা 'জরুরী'। ডাক টিকিট লেগেছে প্রায় দ্বিগুণ। আরেক কোণে লেখা, ব্যক্তিগত।

খামের ভিতর থেকে বার করে আমি চিঠির পাঠ খুলে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তে বসলুম :

পরম কল্যাণীয়াসু,

আপনাকে বারম্বার চিঠি দিয়ে আমাদের সংবাদ জানানোটা অসঙ্গত এবং অন্যায় কিনা আমি জানিনে। আজ এই জরুরী চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে এবং আমার নিজেরও গরজে। শ্রীমতী মিলির বিশ্বাস, আপনার মনে তাঁর জন্য একটি স্নেহের আশ্রয় আছে।

আমাদের বিবাহের পর গত দেড় বছর আমরা অতিশয় দুর্যোগ এবং দুর্দশার মধ্যে কাটাচ্ছি। কিন্তু তার জন্য আমার অথবা শ্রীমতী মিলির কিছুমাত্র অনুশোচনাও যেমন নেই, তেমনি আপনার কাছে কোনও প্রকার সহানুভূতিও কামনা করিনে। আপনার সঙ্গে আমাদের যে অদ্ভুত সম্পর্ক সেটি স্নেহসূচক অথবা বন্ধুত্বসূচক

কোনটাই নয়। অথচ আজ এমন একটি মিষ্ট বন্ধুত্বর সম্পর্ক আপনিই আমাদের সঙ্গে গড়ে তুলেছেন যেটি আপনার প্রকৃতিগত সৌজন্য এবং আশ্চর্য ঔদার্যের পরিচয় দেয়। আপনার প্রতি আমার স্ত্রীর অনুরাগ আন্তরিক এবং অকৃত্রিম। আমি নিজে আপনার চরিত্রের মহিমা এবং সততার প্রতি একান্তই শ্রদ্ধাশীল।

আমার বাবা আদর্শ চরিত্র ছিলেন, এ আপনার জানা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমার জীবনে একটি অতি জটিল সমস্যা এনে দিয়ে যান। আপনার কাছে আমি পরম কৃতজ্ঞ যে, আপনি সেই সমস্যার উপযুক্ত মীমাংসা করেছেন। আমাদের উভয়ের জীবন আপনার কাছে ঋণী হয়ে রয়েছে।

যিনি আমার জননী নামে আপনাদের নিকট পরিচিত, তিনি আমাদের বন্ধু নন। তাঁর ভুল-ভ্রান্তি অনেক আছে, কিন্তু এই পত্রে আমি তাঁর সমালোচনা বা নিন্দা করতে প্রস্তুত নই। সে যাই হোক, তাঁর বর্তমান আচরণ আকস্মিকভাবে আমাদের সম্মুখে একটি বিপদ ঘনিয়ে তুলেছে।

এই চিঠি লিখতে বসার কিছুক্ষণ আগে পরম্পরায় সংবাদ পেয়েছি, শ্রীযুক্তা সুরমা দেবী তাঁর এক অনুগত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমানে এসেছেন এবং পুলিশ পাহারায় আমাদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করাবার জন্য বর্ধমান থেকে রওনা হয়েছেন। অবশ্য মাঝখানে প্রায় তেতাল্লিশ মাইল পথে দুটি ছোট নদী এবং একটি বড় বিল পড়ে। তাছাড়া এখন শ্রাবণ মাস, গ্রামের পথ ও মাঠঘাট কাদায় ভরা। এখানে এসে পৌঁছতে তাঁদের যথেষ্ট সময় লাগবে।

উভয়ে গ্রেপ্তার হলে আমাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে কিছুকালের জন্য মুক্তিলাভ করতুম। কিন্তু আমার স্ত্রী বর্তমানে অতিশয় অসুস্থ এবং ঔষধ পথ্যের অভাবেই হোক বা যে কোনও কারণেই হোক, তিনি অনেকদিন থেকেই একপ্রকার শয্যাগত। সুতরাং এই থানা-

পুলিশের ধকল ·এবং উত্তেজনা তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। আমরা উভয়ে কাল প্রত্যুষে গরুর গাড়িতে এই গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাব, এবং পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটি ধানকলে যেখানে আমি কাজ করি--সেখানে পৌঁছে যদি একখানা ট্রাকের সাহায্য পাই সেটি দেখব। আগামী কাল থেকে দুটি দিন বাধ্য হয়ে ধানকলে আমাদের কাটিয়ে যেতে হবে। কেননা সম্পূর্ণ এক-সপ্তাহের মজুরি না পেলে ট্রাকের ভাড়া দেওয়া সম্ভব হবে না।

কলকাতায় একমাত্র বুড়ো দাদুর ওখানেই যেতে পারতুম। কিন্তু সুরমা দেবীর জন্যই কলকাতায় কোথাও গিয়ে সস্ত্রীক আশ্রয় নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের জীবনের বর্তমান দুর্যোগ ও দুর্গতি যত ভয়াবহই হোক আপনার সাহায্যলাভের কথা মনে আসা আমাদের পক্ষে একেবারেই সঙ্গত ও শোভন নয়। কিন্তু এই চরম দুর্দিনে নিঃস্বার্থ কোনও আপনজনের কথা কল্পনা করতে গিয়ে আপনাকেই কেন বার বার আমাদের মনে পড়ছে এটি বিশ্লেষণ করে ভাববার সময়ও আমাদের হাতে নেই। এই জরুরী চিঠি এখনই ডাকহরকরার হাতে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

ধানকলের দু'তিনখানি ট্রাক সাধারণত এখান থেকে বেরিয়ে মধ্যরাত্রে কলকাতায় টালিগঞ্জের আড়তে গিয়ে পৌঁছয়। আগামী সোমবার মধ্যাহ্নে যদি কোনও একখানা ট্রাকে জায়গা নিতে পারি তবে রাত্রে অমনিই একটা সময়ে যেমন করেই হোক আমরা ডায়মণ্ডহারবার রোড এবং আমতলার সংযোগ স্থলে পৌঁছে আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আপনাকে যদি সেখানে না দেখতে পাই তবে অসুস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অত রাত্রে ঠিক কোন্ দিকে অগ্রসর হব সেটি এখান থেকে ভেবে রাখা কঠিন। অধিক বাহুল্য। ইতি—

সোমনাথ

চিঠির তারিখ, সময়, ডাকের ছাপ এবং আজকের তারিখ মিলিয়ে আমি একটু চঞ্চল হলুম। কেন না আজই সেই সোমবার!

উপরের ঘরে এসে দেখি, ছুঁড়ি আমার খাটের বিছানায় অকাতরে ঘুমচ্ছে। মাথার কাছে জানলার বাইরে মেঘ করেছে এবং জলো হাওয়া আসছে দেখলুম।

চারুকে ডাকতে ইচ্ছা করল না। পোড়ারমুখি তখন আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য বলেছিল, দাত্থ, হিসেব করে দেখলুম তুমি আমার চেয়ে সামান্য আটচল্লিশ বছরের বড়। স্নুতরাং একটু এদিক ওদিক হলেই ত' এটা আমার শ্বশুরবাড়ি হতে পারত।

আমি তেড়ে গিয়েছিলুম! চারু স্নানের ঘরে ঢুকে দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ করেছিল!—

আমি আস্তে আস্তে মাথার দিককার জানলাটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। আজ সোমেন এবং মিলির জন্য প্রবল দুশ্চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঢুকেছে বটে, কিন্তু এটি আমার আনন্দের দিন যে, চারুর বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী পুষ্পলতা এই প্রথম আমার এখানে পদার্পণ করতে আসছে!

গায়ে একটা জামা ও পায়ে জুতো দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম।

ঘণ্টা তিনেক লাগল আমার ফিরে আসতে। উপরে উঠে গিয়ে দেখি, শ্রীমতী পুষ্পলতা ফিরে এসেছে দেবরের বিবাহ উপলক্ষ্যে নব-বধূর পাকস্পর্শ সেরে। ওরা দুজনে হাসিখুশীর গল্পে মেতেছিল। পুষ্পলতা উঠে এসে আমার পায়ে প্রণাম করে হাসিমুখে দাঁড়াল। চারু বলল, দিদি, তুই কিন্তু ভাই আজ থেকে আমার সতীন হলি!

পুষ্পলতা অতি মিষ্ট হাসি হেসে বলল, দেখছেন দাত্থ, এবাড়ি ছেড়ে ওর আর কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই।

তুইও দিন দুই থাক্ দিদি, দেখবি তোরও যেতে ইচ্ছে করবে না!

—চারু বলল, দাছু, তুমি আরেকখানা ডবল বেডের খাট এনে পাতো ওপাশে!

দুই বোন এবং তাদের সঙ্গে এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ একই কালে উচ্চরোলে হেসে উঠে ঘর ভরিয়ে তুলল।

খান দুই গরদ কিনে এনেছিলুম। পুষ্পলতা শাড়িই পরে লক্ষ্য করেছিলুম। ওরা যখন গরদ দুখানি পরে যাবার আগে সামনে এসে দাঁড়াল, আমি ওদের হাতে দুটি আংটি পরিয়ে দিলুম।

পুষ্পলতা বলল, বড্ড লজ্জায় ফেললেন, দাছু। এ যে হীরের আংটি মনে হচ্ছে!

হেসে বললুম, দোকানদারও অবশ্য হীরে ব'লেই বেচল! এখন আমার কপাল ভাই!—ওকি, চোখের জল ফেলছিস কেন, চারু ভাই?

চারুলতা আমার পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে এবার ফুঁপিয়ে উঠল। আমি তাকে তুলে ধ'রে বললুম, এবার কেমন জব্দ? আর ঝগড়া করবি?

গলার কাছে মুখ রেখে চারু কেঁদে বলল, আমি যেন তোমার ভালবাসার যোগ্য হই, দাছু!

বুড়ো মোতিচাঁদ ওদের জন্য একখানা ট্যাক্সি এনে বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমি চারুকে ব'লে দিলুম, তাকে কোনও উপদেশ আমি দেবো না, চারু। ছেলে মেয়ে দুটোর ব্যবস্থা তুইই করবি। আমি ওদের সমস্ত খরচপত্র দেবার জন্য প্রস্তুত রইলুম।

চারুলতা বলল, তুমি আমাকে সাহায্য কর, দাছু। মনে হচ্ছে সোমেনবাবু আমার হাতে মিলিকে দিয়ে কোথাও চলে যাবেন। তুমি সকলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে চল। হোক তোমার কষ্ট। অসুস্থ মিলিদিকে নিয়ে আমি কি করব বুঝতে পারছিনে!

পুষ্পলতা বলল, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না।

আমাদের ওখানে আপনার গিয়ে কাজ নেই, দাদু। নানা কথা উঠবে।

আমি তা হলে কি করব বল ?

পুষ্পলতা বলল, আপনি বরং গাড়ি নিয়ে ওই দুটো রাস্তার মোড়ে ঠিক সময়ে অপেক্ষা করবেন। এদিক থেকে চারু যাবে যেমন করেই হোক।

চারু বলল, সেই ভাল, দাদু। তুমি তাই ক'রো। আমরা তাহলে এগোই।

এসো ভাই। বেশ, এই কথাই রইল। আমি তাহলে ঠিক সময়ে গিয়ে উপস্থিত হব।

ওদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

সোমেনের চিঠিখানা চারু আমার কাছেই রেখে গেল। ঘরে ঢুকে চিঠিখানা আরেকবার আদ্যোপান্ত পড়লুম। বাইরে মেঘলা দিন। এখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। মধ্যরাত্রির কিছু আগেই অবশ্য আমি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারব। ইতিমধ্যে আমার বন্ধুর সেই বড় গাড়িখানা নিযুক্ত করার জন্য আমাকে আর একবার বেরোতেই হল।

মনুষ্যত্বের পরীক্ষা ছিল চারুলতার সামনে দাঁড়িয়ে।

চিঠিখানা সুলিখিত, সন্দেহ নেই। ওর মধ্যে সৌজন্য, সৎশিক্ষা এবং সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের অনন্যসাধারণ সততা এবং আদর্শ অনুরাগের চিহ্ন ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। এমন ভদ্র ও একনিষ্ঠ স্বামী যে কোনও নারীর পক্ষে কাম্য।

কিন্তু এ পরীক্ষা ত মিলির স্বামীর সততা ও সাধুতার নয় ? বরং বিবাহের পাঁচ বছরের মধ্যেও যে নারীর কাছে স্বামী শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একটি দিনের জন্যও সত্য ও বাস্তব হয়ে ওঠেনি, এটি তার পরীক্ষা !

পৃথিবীর সমস্ত দেশের সকল সমাজ একথা নিশ্চিতভাবে বলবে, সোমেন এবং চারুলতা—এরা দু'জন স্বামী ও স্ত্রী! এদের সম্পর্কের মধ্যে ফাঁকি বা তঞ্চকতা নেই, সত্যের নির্মল মহিমার উপর এই সত্য সম্পর্ক চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সেখানে সহস্র মিলির সর্বপ্রকার দাবী অতি তুচ্ছ।

কিন্তু চারুলতা জানে, তুচ্ছ নয়! শাস্ত্র ও ধর্মের সত্যের সঙ্গে জীবনের সত্য অনেক সময় মেলে না। বিবাহ বড় হতে পারে, কিন্তু পরম অমৃতের আস্বাদ বিবাহ অপেক্ষা অনেক বড়। একদিন এই কথাটি বিচার করে চারুলতা শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসবার আগে মাথার সিঁদুর মুছতে চেয়েছিল!

আজ তার হৃদয়ের দোলা কিছু নেই, কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ কিছু আছে বৈকি। বিপদের থেকে বন্ধুকে উদ্ধার কে না করে? অপরিচিত ব্যক্তি যদি তার দুর্দিনে সাহায্য চায়,—সেখানে সাহায্যের হাত বাড়ানো যায় বৈকি! শত্রু যদি তার দুঃসময়ে এসে কেঁদে পড়ে, তাকে তুলে ধরতেও বাধে না! কিন্তু এখানে যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বিগত পাঁচ বছরে, তার ব্যাখ্যাও যেমন নেই, তেমনি তার মধ্যে বাধ্য বাধকতাও কিছু থাকতে পারে না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, চারুলতার মনে না আছে মোহ, না বিকার, না ভাবান্তর। মনের গহন গভীরে যতদূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি চলে, দেখা যায় সেখানে অনাহত অনাসক্তি! চারুর মধ্যে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি নেই। নিজের কাছে নিজে সে অতি স্পষ্ট।

শোবার ঘরের দেওয়ালের উপর বড় ঘড়িটা টিক টিক করছে। ঘর অন্ধকার। পল্লীগ্রামে সন্ধ্যার পরেই সব নিশুতি, তার উপর আজ আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। ও-বাড়িতে আহারাদি সেরে একে একে সবাই যে যার ঘরে উঠেছে, আর কোথাও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

চারুলতা একবার উঠে গিয়ে জানলার বাইরে দেখে এল সেই অন্ধকার পল্লীগ্রামের উপরে ভয়াবহ শ্রাবণের ধারার সাংঘাতিক মাতামাতি চলছে। আকাশ মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের তরবারির আঘাতে, এবং মহারুদ্রের সেই বজ্রদণ্ড আঘাত হানছে বার বার হৃৎপিণ্ডের উপর।

অন্ধকারে চুপি চুপি পুষ্পলতা বলল, কেমন করে যাবি?

চারুলতা বলল, বৃষ্টি ধরবে মনে হচ্ছে না! যদি না যাই, দিদি?

ও কথা বলতে নেই, চারু। দাদুকে কথা দিয়ে এসেছিস। তাছাড়া সোমেনবাবু আসছেন অমন অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে। তুই না গেলেই চলবে না!

চারুলতা টর্চ টিপে ঘড়িটার দিকে দেখল। রাত প্রায় এগারোটা বাজে! আর দেরি করা চলে না। এক সময় সে বলল, এত দুর্যোগে ওরা যদি না এসে পৌঁছয়, দিদি?

পুষ্পলতা বলল, তুই দেখবি ঘণ্টা দুই, তারপর ফিরে আসবি। আমি জেগেই থাকব তোর জন্যে। কিন্তু একটা কথা—

নীচু গলায় চারু প্রশ্ন করল, কি?

মিলিদিকে কোথায় তুলতে চাস? আমাদের এখানে আনতে পারবি? কিন্তু তাহলে সোমেনবাবুকে অন্য কোথাও চলে যেতে হয়!

চারু বলল, ওসব ব্যবস্থা দাদুর ওপর ছেড়ে দেবো। যদি এখানে মিলিদিকে আনি তাহলে আজ রাত্তিরের মতন আমাদের ডাক্তারখানার দোতলার ঘরে রেখে দেবো। ওখানে তিনুর মা আছে। আমার কিন্তু ভাই একলা যেতে ভয় করছে।

অন্ধকারে পুষ্পলতা একটু হাসল। বলল, তোর আবার ভয়! কিন্তু আর নয়, এবার বেরিয়ে পড়, ছাতাটা নে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে টাকাটা বেঁধে রাখ। ভয় কিসের? আমি জেগে রইলুম।

চারু প্রস্তুত হয়ে নিল। চুলটা ভাল করে ফিরিয়ে বাঁধল। টাকা গুছিয়ে রাখল। টর্চটা ডান হাতে, বাঁ হাতে ছাতা। শুধু পা। তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে শূন্য ও নির্জন মহল পেরিয়ে নিঃশব্দে নীচের তলায় নেমে গেল। কাছারী বাড়ির লোকজন রয়েছে ছড়িয়ে আশপাশের ঘরগুলিতে! বড় দরজাটা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গাদালানের পাশে ছোট দরজাটা খুলে চারু আমবাগানের দক্ষিণ দিকে গিয়ে নামল। এদিকে মধ্যে মাঝে সাপখোপের ভয় থাকে। কিন্তু সে আর কোন দিকে তাকাল না,—হনহনিয়ে সেই প্রবল বৃষ্টিধারার ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। প্রেতিনীর মতো ছুটল।

পাকা বড় রাস্তাটার দিকে তাকালে ভয় করে। কয়েক রশি এগিয়ে গেলেই দু'ধারে ধানক্ষেত, দূরে দূরে বন বাগান এবং নারকেল গাছের জটলা। আকাশ ডাকছিল মাথার উপরে। দুরন্ত বায়ুর ঝাপটের সঙ্গে বৃষ্টির মুষলধারায় ছাতাটাকে কোনমতেই বাগ মানিয়ে মাথার উপর ধরে রাখা যায় না! তা ছাড়া খোলা ছাতা বাতাসের বেগে তাকে সুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এ বিপদটার কথা চারুলতার আগে মনে হয়নি। ছাতা থাকা সত্বেও তার সর্বাঙ্গ ভিজে এবার জল পড়ছিল। কিন্তু আধ মাইল কোন মতে পেরিয়ে আসতে যে দশা তার দাঁড়াল, এর পর নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌছতে ঘণ্টা দুই আরও লাগবে বৈ কি। দুর্যোগের কথাটাই দুই বোনে বসে এতক্ষণ ভাবছিল, কিন্তু মধ্যরাত্রে একটি মেয়ের পক্ষে এই দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করাটা ঠিক কেমন,—এটি এতক্ষণ পরে নিজের দিকে তাকিয়ে চারুকে ভাবতে হল। অতঃপর মনসাতলার কাছাকাছি এসে রাখু মুদির দোকানে আলোটা দেখে সে একটি বার থমকিয়ে দাঁড়াল এবং নিজের কাপড় চোপড়ের সপসপে অবস্থাটা লক্ষ্য করে উৎসাহটা তার স্তিমিত

হয়ে এল। না, ছি, এ অবস্থায় সেখানে কোনমতেই যাওয়া চলে না।

কিন্তু ফিরবে সে কেমন ক'রে? কোন্ মুখে? তার বাপের বাড়ির সুনাম, তাদের আভিজাত্য, তার নিজের মনুষ্যত্ব এবং তার চিত্তধর্মের এই পরীক্ষা! এ দুর্যোগ শেষ হবে, সোমেন বাবু ও তাঁর স্ত্রীর ভাগ্য একদিন ফিরবে, শ্রাবণের কান্নার পর আশ্বিনের হাসি হেসে উঠবে একদিন নীলকান্ত আকাশে,—কিন্তু সে নিজে আজকের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দোলার জন্য নিজের কাছেই চিরকালের মতো ছোট হয়ে যাবে! না, সোমেনের কাছে তার মাথা হেঁট হলে কিছুতেই চলবে না।

চারুলতা নিজের মধ্যেই জোর পেয়ে গেল। সম্ভবত রাখু মুদির দোকানের আলোটা বাঁচিয়ে আড়াল দিয়ে সে দ্রুতপদে এগিয়ে যাবার চেষ্টা পাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ বাঁশঝাড়টার তলা থেকে সাড়া এল, চারু? এই যে গাড়ি—

ভূতের মতো পথের পাশে মোটর গাড়িখানা দাঁড়িয়ে। তারই দরজা খুলে আমি ডাকলুম, আমি দাদু রে, শিগগির উঠে আয়—

সর্বাঙ্গে জল ঝরছিল চারুর। আমাকে দেখামাত্রই সে চট ক'রে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারপর সহাস্যে বলল, তুমি এখানে? এ রাস্তায় তোমার আসবার কথা নয় ত?

বললুম, প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে এসেছি। জানি এই পথ দিয়েই তুই যাবি। দাঁড়া, একেবারে নেয়ে উঠেছিস! আগে জামা-কাপড় ছেড়ে নে দিকি? ছাতাটা দে আমাকে—

জামা কাপড় ছাড়ব কেমন ক'রে?—চারু প্রতিবাদ জানাল।

বললুম, পোড়ারমুখী তুমি! নতুন গরদের শাড়ি প'রে বিকেলবেলা আমার ওখান থেকে দপদপিয়ে বেরিয়ে এলে! আর ওদিকে যে

তোমার জামা কাপড় সুদ্ধ হ্যাণ্ডব্যাগটি পেছনে পড়ে রইল, ল্যাজ তুলে দেখে আসনি ? এই যে হ্যাণ্ডব্যাগ—

চারু আহ্লাদে হেসে উঠল। ড্রাইভার নেমে গেল তার বর্ষাতি ঢাকা দিয়ে। ছাতাটা খুলে আমি নেমে দাঁড়ালুম। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল।

অন্ধকার গাড়ির মধ্যেই যেমন তেমন ক'রে গা-মাথা মুছে চারুলতা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় ইত্যাদি বদলিয়ে নিল, এবং ভিজা গামছা ও শাড়ির সাহায্যে গাড়ির সীট মুছে পরিষ্কার করল। অতঃপর আমরা ভিতরে উঠে এসে বসলুম এবং ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। চারুর মনে সম্ভবত কৃতজ্ঞতাবোধ জমে উঠেছিল। সে বাঁ হাতে আমার পিঠের দিকটা জড়িয়ে বলল, ভাগ্যি তুমি এলে দাদু !

বললুম, আকাশের অবস্থা দেখেই এলুম রে ! তোদের বাড়ির কাছাকাছি দাঁড়ালে পাছে কেউ খোঁজখবর করে তাই এখানে ছিলুম।—উপেন, আমার নাতনীকে একটু ডাকাবুকো মেয়ে মনে হচ্ছে, না ?

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি ছুটছিল। ষ্টিয়ারিং ধরে এবং হেডলাইট জ্বালিয়ে হাসি মুখে উপেন বলল, ওঁকে ত' আমিই সেবার এখান থেকে আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলুম—!

একটি অনুরোধ তোমাকে জানিয়ে রাখি, উপেন।—আমি পুনরায় বললুম, আজকের এই সব ছুটোছুটির ব্যাপার নিয়ে তুমি ভাই কা'রো সঙ্গে আলোচনা কর না—কেমন ?

যে আজ্ঞে !—উপেন জবাব দিল।

এবার চারুলতাকে বললুম, অনেক বয়স হয়েছে আমার, চারু। কবে বলতে কবে মরে যাব ! কিন্তু শেষ বয়সে তোর মতন আশ্চর্য মেয়েকে দেখে গেলুম, এই পরম লাভ, এই আমার পাথেয় ! তোকে আমার শেষ নমস্কার জানিয়ে যেতে চাই, চারু।

চারু আমার পিঠের দিকে মুখ লুকিয়ে বোধ হয় কাঁদল। তারপর বলল, আমি যেন তোমার আশীর্বাদের যোগ্য হই, দাদু!

রাত বারোটা। আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল আমতলা এবং ডায়মণ্ডহারবার রোডের সংযোগস্থলে। কোথাও কোনও ট্রাকের চিহ্নমাত্র নেই। দুরন্ত ঝটিকার বায়ুশ্বননে হু হু করছিল জনহীন পথ—সেই ঝটিকাহত প্রবল বারিধারা রুদ্রাণীর আকাশজোড়া সম্মার্জনীর মতো আঘাত ক'রে ফিরছে সমগ্র সৃষ্টিকে! ভীতচক্ষে আমরা ঝাপসা কাচের জানলার বাইরে ব্যাকুলভাবে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলুম।

ও কি, কি করছ দাদু, না না—দরজা খুলো না,—নেমো না দাদু,—তুমি বুড়ো মানুষ! বাজ পড়ছে দেখছ না!—দাদু—

ভয় কি ভাই!—আমি বললুম, ওই যে দেখতে পেয়েছি ওই সামনের আটচালায়—মনে হচ্ছে ওরাই—আমি এগোই—

বলতে বলতে আমি নেমে গেলুম। সামনেই মহাজনী গদির আটচালা। তারই নীচে ময়লা হারিকেন জ্বলছে। বৃষ্টির ঝাপটায় সেটা এতক্ষণ কারো চোখে পড়েনি। আটচালায় গদীর মালিকরা দোকান বন্ধ করে চলে গেছে। তারই কোলের বারান্দাটুকুর একপাশে হারিকেনটি সামনে রেখে সোমেন বসেছিল এবং তার পাশে কাঁথাকুঁথি জড়ানো শায়িত অবস্থায় মিলি একপ্রকার মুখের শব্দ করছিল।

রাস্তার ওপার থেকে গাড়িখানা ঘুরিয়ে ততক্ষণে ওরাও এসে আটচালার কাছে দাঁড়িয়েছে। চারুলতা পলকের মধ্যে নেমে এল! উপেন টর্চটা নিয়ে জ্বালল।

মনে মনে শিউরে উঠেছিলুম এই দৃশ্য দেখে।

সোমেন উঠে এসে বলল, এসেছি অনেকক্ষণ, বুড়ো দাদু। কিন্তু আজ সারাদিন মিলির কোনও জ্ঞান নেই। কি যে হল। শুধু থেকে-

থেকে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে! ট্রাকে ওঠবার পর থেকেই এই। অনেক দিন থেকে আমাশয়ে ভুগছিল!

দাত্থ!—ওপাশে বসে অস্ফুটস্বরে চারু আমাকে ডাকল, শুনে যাও। মিলিদির সন্তান হবে। ব্যথা উঠেছে! অজ্ঞানে কষ্ট পাচ্ছে!

পলকের মধ্যে আমাদের সমস্ত বিবিধ পরিকল্পনা ভেসে গেল। বললুম, ও, আচ্ছা—তবে সোজা হাসপাতালে নিয়ে চল, উপেন। আর এক মিনিট দেরি নয়—

সেই অবস্থাতেই সোমেন, চারু এবং উপেন ধরাধরি ক'রে মিলিকে কোনমতে গাড়িতে তুলল। অতঃপর সেই মুষলধারার মধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সোমেন আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ডুকরে কেঁদে উঠল, দাত্থ, দাত্থ, বিনা দোষে কেন তোমরা সবাই মিলে আমাদের ত্থজনকে এমন ক'রে শাস্তি দিলে! বলতে পার, মা-বাপ হয়ে কেন সন্তানকে এমন করে অপমানের তলায় নামিয়ে আনল? বল—বল তুমি, বুড়োদাত্থ···!

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা বোধ হয় এই বৃদ্ধের চোখেও নেমেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ধমনীর প্রাচীন রক্তেও তোলপাড় এনে দিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বললুম, চোপরও ষ্টুপিড! মা-বাপ নয়, ওরা তোর নিয়তি, ওরা তোর ভাগ্য! ওই নিয়তি এই পরম শিক্ষা তোকে দিচ্ছে, ত্থর্যোগে ভয় পাবিনে, ত্থঃখে টলবিনে, বেদনায় কাঁদবিনে! এই মহৎ শিক্ষা দেবার অধিকার শুধু মা-বাপেরই আছে, সোমেন। নে, গাড়িতে ওঠ্—

পিছনের সীটে চারু কাঠ হয়ে বসেছিল, এবং তার হাতের মধ্যে আসন্নপ্রসবা অচেতন মিলি সেই জ্ঞানহারা অবস্থায় যন্ত্রণা সইতে না পেরে নড়ে চড়ে কাতরোক্তি করছিল।

গাড়ি আমাদের বহুদূর ছুটে চলল টালিগঞ্জের দিকে। বৃষ্টি

সমানেই পড়ছে, তবে সেই ঝাপটাটা আর নেই। ঘনঘন আর মেঘ ডাকছে না।

রেলের পুল পেরিয়ে আলিপুরের দিকে এসে পৌঁছতে লাগল প্রায় একঘণ্টা, কারণ গাড়ির চাকা ডুবে যাচ্ছিল জলে। কিন্তু আলিপুরের একস্থলে বদ্ধ জলরাশির মধ্যে ঢুকে এবার হঠাৎ গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। বারবার ষ্টার্ট এবং বোতাম টেপাটিপিতেও গাড়ি কিছুতেই আর নড়তে চায় না। গাড়িখানা বড়, ওজন অনেক বেশী।

উপেন, গাড়ি যে দাঁড়িয়ে গেল, ভাই?

উপেন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ,—পিছন থেকে ঠেলতে হবে।

সকলের আগেই উপেন জলের মধ্যে নামল। তার দেখাদেখি নামল সোমেন। আমাকে ওরা মানা করছিল নামতে। কিন্তু আমার পরলোকগতা পিসির সম্পত্তি ভাঙ্গিয়ে আমিও এককালে কিছু দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করেছিলুম। সুতরাং আমিও খালি পায়ে নেমে ওদের সঙ্গে গাড়ির পিছন ধরে ঠেলতে আরম্ভ করলুম। গাড়ির ভিতরে চারুলতা ভীত ও স্তব্ধ হয়ে বসে মিলির অবস্থা লক্ষ্য করছিল।

মিনিট দশেক ঠেলতে ঠেলতে সবাই মিলে সেই গাড়ি জলের বাইরে নিয়ে এলুম। গাড়ির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জল ঢুকেছিল। সুতরাং সেই গাড়ি ষ্টার্ট দিতে আরও পাঁচ সাত মিনিট লাগল। আমরা আবার উঠে যে যার জায়গায় বসলুম। গাড়ি আবার ছুটল।

ভবানীপুরের হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছলুম রাত তখনও দুটো বাজেনি।

রোগিনী সম্পূর্ণ অজ্ঞান। সুতরাং তৎক্ষণাৎ ষ্ট্রেচার আনা হল। মিলিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কোনমতে তুলে তারা ভিতরে নিয়ে গেল। আমাদের আর কিছু করবার ছিল না। নিরুপায় আতঙ্কে যখন উন্মুখ হয়ে আছি, তখন মিনিট পাঁচেক পরে ভিতর

থেকে সংবাদ এল, রোগিনীকে অস্ত্রোপচারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে!

কেন?—ব্যাকুল কণ্ঠে সোমেন ফিরে দাঁড়াল,—কেন?

জবাব দিল না কেউ। আমি সোমেনের পিঠে এবার হাত রেখে বললুম, শান্ত হ ভাই। চঞ্চল হোস নে।

দু'পা এগিয়ে এসে চারুলতা আঁচলের গেরো খুলে অনেকগুলি দশ টাকার ভিজে নোট্ বার ক'রে বলল, দাদু, এ টাকা তুমি রাখ। যেমন ক'রে হোক, যত টাকাই লাগুক, মিলিদিকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

ভিতর থেকে টেলিফোনে খবর এল, রোগীকে আরও দশ-বার ঘণ্টা আগে আনা উচিত ছিল!

কেন?—সোমেন রক্তচক্ষে আবার চেঁচিয়ে উঠল, আরেকবার আমি মিলিকে দেখব!

বাইরে একখানা গাড়ি দ্রুত এসে দাঁড়াল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জন দুই ডাক্তার অতি ব্যস্তভাবে প্রবেশ ক'রে ভিতর মহলে চ'লে গেলেন। আবার মিনিট পাঁচ-সাত কাটল। এমন সময় একজন নার্স বাইরে এসে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে সোমেনকে বললেন, এই কাগজে একটি সই ক'রে দিন্।

সই ক'রে দিয়ে সোমেন প্রশ্ন করল, উনি কেমন আছেন? জ্ঞান ফিরেছে কি?

একটু বাদে খবর পাবেন।—নার্সটি চ'লে গেল।

চারু নতমুখে নিঃশব্দে বসেছিল। কঠিন ও মর্মান্তিক এক একটি মিনিট যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে আবার আমি টেলিফোন ধরলুম। ভিতর থেকে খবর এল, দেখুন, ব্যস্ত হলে চলবে না। রোগীর উপর বিশিষ্ট তিন জন ডাক্তার অপারেশন আরম্ভ করেছেন। রোগী এবং তাঁর সন্তান উভয়কেই বাঁচাবার চেষ্টা চলছে। রোগী এখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

সোমেন আর্তনাদ ক'রে উঠল, চাইনে, দাত্থ, সন্তান চাইনে! আমি মিলিকে চাই—মিলিকে—সে বেঁচে উঠুক!

নিশুতি রাত্রে হাসপাতালের ঘরখানার মধ্যে সোমেনের ভগ্ন কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে ভিতর থেকে হঠাৎ সংবাদ এল, মিলি চট্টোপাধ্যায়ের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। নবজাত শিশু সুস্থ আছে। শ্রীমতী মিলির এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তাঁর চিকিৎসা চলছে। চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে আবার আপনারা সংবাদ নেবেন!

রাত সাড়ে তিনটে। আকাশের দুর্যোগ এবার থেমে গেছে।

হাসপাতাল থেকে সোমেনের নড়বার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সকাল সাতটা আটটার আগে আর কোনও খবর কিছুতেই যখন পাওয়া যাবে না, তখন আমি সোমেনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বা'র করে নিয়ে এলুম। উপেন আমাদের দুজনকে আমার ওখানে নামিয়ে দিয়ে চারুলতাকে বাড়ি নিয়ে যাবে। সেখানে গাড়ি দাঁড়াবে। চারুলতা স্নানাদি সেরে হরিমোহনকে জানিয়ে ওই গাড়িতেই আবার এসে আমার ওখানে পৌঁছবে সকাল সাতটার আগে।

মোটামুটি এইরূপ স্থির করে আমরা গাড়িতে উঠে বসলুম। নির্বাক তিনটি প্রাণীকে নিয়ে উপেন আবার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

রাত্রির শেষ অংশটুকু সর্বাপেক্ষা অন্ধকার—কে যেন বলেছিল। বাইরে সাঁ সাঁ করছিল শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। মহানগরী নিদ্রাভিভূত।

বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলুম। পায়ের দিকে বসেছিল সোমেন। বিগত দেড় বছরের কাহিনী সে ব্যথিত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে। সামাজিক উৎপীড়ন, লোকলাঞ্ছনা, মানুষের ক্ষুদ্রতা, অপমানজনক ঘটনা,—এগুলি স্পষ্ট হচ্ছে তার বর্ণনায়। ছদ্মনাম গ্রহণের প্রকৃত

কারণ সে বলল। দারিদ্র্য এবং অন্নাভাবের ভয়াবহ ছবি যেন দেখতে পেলুম।

সকল মহত্ত্বেরই অগ্নিপরীক্ষা থাকে। সত্যপালনের জন্য বনে যেতে হয়, ন্যায়ধর্ম ও আদর্শরক্ষার জন্য সর্বস্ব ছেড়ে চলে যায়, প্রেমাস্পদের জন্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। আরও অনেক ঘটনাই ঘটে। ভালবাসা মহৎ হয়ে ওঠে অপমান, উৎপীড়ন, দারিদ্র্য এবং আত্মত্যাগের মধ্যে। যত সে দগ্ধ হতে থাকে ততই তার দীপ্তি বাড়ে। চোখের জলে তার সৌন্দর্য, বেদনায় তার সম্মান, যন্ত্রনায় তার গৌরব। ভালবাসা সেখানে অধ্যাত্ম সাধনায় উন্নীত।

শ্রীমতী মিলির সেই নিপীড়নের কাহিনী বলতে বলতে মাঝে মাঝে সোমেনের গলা ধরে আসছিল। আমি তন্ময় হয়ে তার দিকে চেয়ে ছিলুম।

প্রভাতের প্রথম আলো যখন দেখা দিল তখন পাচক এসে ঘরে ঢুকল। দুখানা কাচের থালায় সে এনেছে গরম গরম শিঙ্গাড়া ও মোহনভোগ। কথায় কথায় এর আগে বুঝতে পেরেছিলুম, প্রায় দেড়দিন থেকে সোমেন একপ্রকার উপবাসে রয়েছে। প্লেট দু'খানা রেখে পাচক বলে গেল, চায়ের জল চড়িয়েছি!

আমি সোমেনকে এবার তুললুম। উঠে দাঁড়িয়ে প্লেট দুখানার দিকে কিছুক্ষণ অবধি সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, বুড়োদাদু, আমি একেবারে স্নান করে আসি। ততক্ষণ চা হোক।

সোমেন গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল।

পথে অল্পস্বল্প মানুষের সাড়াশব্দ এবং দু'একখানা গাড়ির গতির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আমি মুখ হাত ধুয়ে এলুম। ঠাকুর এবার চা দেবে। স্নানের ঘর থেকে সোমেন এবার বেরোবে। বলা বাহুল্য, আমাদের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। ছেলেটাকে

কোনমতে আশ্বাসবাক্যে এতক্ষণ ভুলিয়ে রেখেছি। চারুলতা এসে পৌঁছবামাত্র আমরা যাব হাসপাতালে। আমাদের ভয়ানক তাড়া রয়েছে।

এমন সময় নীচের থেকে আমার ভৃত্য রাধাপদ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসে বলল, আপনি একবার নীচে আসুন, বড়বাবু।

কেন রে?

দু'খানা গাড়ি নিয়ে পুলিশের লোকজন এসে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে ডাকছে!

আমার চমক লাগল। বললুম, পুলিশ? কই দেখি চল্‌ত?

আমি নীচে নেমে গিয়ে সোজা সদর দরজায় এলুম। রাধাপদ ঠিকই বলেছে। দু'জন পোশাকপরা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, আমাদের ক্ষমা করবেন, একটু কষ্ট দিতে এলুম। আপনিই কি অবিনাশচন্দ্র রায়?

বললুম, হ্যাঁ, কেন?

একজন সবিনয়ে বললেন, দেখুন, আপনার বাড়ি খানাতল্লাশীর পরোয়ানা রয়েছে আমাদের সঙ্গে—

সবিস্ময়ে বললুম, খানাতল্লাশীর পরোয়ানা? কি জন্যে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি। একটি ছেলে সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ওরফে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বছর দেড়েক আগে একটি নাবালিকাকে তার অভিভাবকের বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে বার ক'রে নিয়ে পালায়—

এবার একটু হাসলুম। বললুম, তারপর?

ক্ষমা করবেন। ছেলেটির এই কাজে নাকি আপনার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। যাই হোক, ছেলেটি বিবাহিত, এবং তার তরুণী স্ত্রী বর্তমান। এতৎসত্ত্বেও সে ওই নাবালিকাটিকে বিবাহ করে। সুতরাং ছেলেটির বিরুদ্ধে তিনটি চার্জ। ছদ্মনাম গ্রহণ, নাবালিকা অপহরণ

এবং এক স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহ। আমরা কয়েক ঘণ্টা আগে বর্ধমান পুলিশ থেকে খবর পেয়ে সন্ধ্যার পর থেকেই আপনার বাড়ির দিকে চোখ রেখেছি। ছেলেটি আপনার এখানেই আছে। তার নামে বডি-ওয়ারেণ্ট আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

আমি কতক্ষণ চুপ করে রইলুম। একথা জানি, এখানে দাঁড়িয়ে পুলিশের লোকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কিন্তু আমার এইরূপ নীরবতায় দারোগা দু'জনের বোধকরি একটু সন্দেহ হয়ে থাকবে। একজন বললেন, দেখুন, ইংরেজ আমলে পুলিশের নানা দুর্নাম ছিল। এখনকার দিনে আমরা পাবলিকের কো-অপারেশন পেলেই খুশী হই। সোমেন্দ্রকে পাওয়া গেলে আর খানাতল্লাশী করতে চাইনে!—এই যে, বোধহয় এরই নাম সোমেন্দ্র--

আমার পিছনে ততক্ষণে সোমেন এসে দাঁড়িয়েছিল। স্নানাদি সেরে সে হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। পুলিশের লোক দেখে ভয়ে তার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে এল।

আমি বললুম, হ্যাঁ, এরই নাম সোমেন্দ্র। ভদ্র শিক্ষিত সত্যবাদী এবং চরিত্রবান। কিন্তু বডি-ওয়ারেণ্টের ওপর আমার আর কিছু বলা চলে না। আপনাদের যা বিবেচনা, তাই করুন।

মেয়েটি কোথায়?

মেয়েটি হাসপাতালে। সেখানে যেতে পারেন আপনারা।—এই বলে আমি হাসপাতালের ঠিকানা দিলুম।

ওরা যখন সোমেনকে ডেকে নিয়ে গাড়িতে তুলছে, আমি তখন বললুম, আপনারা মিনিট পাঁচেক সময় দিলে সোমেন কিছু খেয়ে যেতে পারত। ওর মুখের খাবার পড়ে রইল!

একজন দারোগা বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না অবিনাশবাবু। এ ইংরেজ আমলের থানা নয়। আজকাল আসামীকে ভাল ভাল জিনিসই খেতে দেওয়া হয়! সেকাল আর নেই।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে গাড়িতে ওঠবার আগে সোমেন ভগ্নস্বরে আমাকে প্রশ্ন করল, দাদু, খবরটা কখন পাব ?

ঠিক সময়েই পাবি, ভয় কি ?

সোমেন গাড়িতে উঠল, গাড়িখানা ছেড়ে দিল। দ্বিতীয় গাড়িখানার দারোগা আমাকে প্রশ্ন করে জানলেন, এ বাড়িখানা আমার। অতএব আমাকে ব্যক্তিগত জামিনের একখানা কাগজে সই করিয়ে নিয়ে বললেন, গভর্ণমেণ্ট আপনার প্রবীণ বয়সের প্রতি সম্মান দেখাতে চান্। থানায় আপনার যাবার দরকার নেই।

তিনি দলবলসহ দ্বিতীয় গাড়িখানায় উঠে চলে গেলেন।

ভিতরে এসে যখন চুপ করে এক জায়গায় বসেছি, তখন চারুলতাকে নিয়ে উপেনের গাড়ি এসে দাঁড়াল। চারুলতা দ্রুতপদে এসে আমার ঘরে ঢুকল। আমি রাধাপদকে দিয়ে উপেনকে ডেকে পাঠালুম। চারুলতা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সম্ভবত সোমেনকেই সে খুঁজেছিল। চারুর চোখ মুখ একেবারে কালিমাখা হয়ে গেছে।

উপেন এসে দাঁড়াতেই বললুম, তুমি অনেক কষ্ট করেছ ভাই, সমস্ত রাত জেগেছ। এই পঁচিশটি টাকা তোমাকে আশীর্বাদী দিচ্ছি, ভাই। কর্তাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ো। এবার আমরা ট্যাক্সি পেয়ে যাব।

যে আজ্ঞে—বলে উপেন টাকা নিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

হঠাৎ ফিরে তাকালুম চারুর দিকে। বললুম, কাঁদচিস কেন রে?

চারুর কান্নাও যেন শান্ত ও সংযত। কিন্তু তবু সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, দাদু, আসবার পথে ভাবলুম হাসপাতালের খবরটা নিয়েই যাই—

আতঙ্কিত চক্ষে বললুম, তবে কি মিলি নেই, চারু ?

না দাদু, নেই ! ঘণ্টা দুই আগেই শেষ হয়ে গেছে !

চারুলতার চোখে জল নেমে এল। আমি জানি চারুলতার এই অশ্রুর মধ্যে সোমেনের প্রতি সমবেদনা ছিল। পুরুষের হৃদয়ের যে অম্লান ভালবাসা সকল দুঃখ দুর্গতির মধ্যেও দেদীপ্যমান ছিল, এই অশ্রু হল সেই অভিষিক্ত হৃদয়ের প্রতি নৈবেদ্য উপচার।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। ভাবছিলুম মিলির জন্য সংগ্রাম করেছি অনেক, সুরমার শত্রুতা বরদাস্তও করেছি প্রচুর। কিন্তু চেষ্টা সার্থক হল না!

এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, ছেলেটা জেনে গেল না, এ হয়ত ভালই হল! আমি তাকে সামলাতে পারতুম না, চারু!

মুখ ফিরিয়ে চারু বলল, সোমেনবাবু কোথায়?

তুই আসবার আধঘণ্টা আগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে! তার বিরুদ্ধে সুরমার নালিশ অনেকগুলো!

পাষাণ-পুত্তলীর মতো চারুলতা যেন স্থির হয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে আমি উঠলুম। এই বৃদ্ধ বয়সে মিলি যেন দিয়ে গেল আমার জীবনে শেষবারের মতো ক্লান্তি আর অবসাদ। আস্তে আস্তে গিয়ে আমি স্নানের ঘরে ঢুকলুম। বাচ্চাটা বুঝি সুস্থই আছে এখনও। ওটাকে বাঁচানো দরকার বৈকি। সমস্ত প্রকার বিপ্লবের পরে ওই নবজাত শিশুই হয়ত এনেছে ভবিষ্যৎকালের আশ্বাসবাণী—কে জানে! ওই বাচ্চাই থাক্ মিলির অসম্পূর্ণ কামনার প্রতীক হয়ে। দেখি বাচ্চাটা যদি বাঁচে!

হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যখন চারুর সামনে এসে দাঁড়ালুম, সে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বললুম, চারু, এ বেলাটা তুই এখানে বিশ্রাম নে। এবার আমিই গিয়ে তোকে রেখে আসব।

তুমি কি হাসপাতালে যাচ্ছ, দাদু?

হ্যাঁ। সুরমার সব চেষ্টা সার্থক হল,—এবার আমি মিলির শেষ

সৎকার করে আসিগে—ফিরে দাঁড়িয়ে রুষ্টকণ্ঠে পুনরায় বললুম, সাধারণ লোকে কি বলবে জানিস, চারু? অবাধ্য সন্তান মায়ের হাতে শাস্তিলাভ করল,—ভালই হল!

আমি বেরিয়ে পড়লুম।

* * *

সুরমা দেবীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সোমেনের মামলায় তিনি আমাকে অন্যায়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন, সম্ভবত এই চক্ষুলজ্জার জন্যই আমার সামনে আর তিনি আসেননি।

কিন্তু আমি সুরমার খবর রেখে এসেছি বরাবর। মাস ছয়েক আগে তিনি যে তাঁর রিজেণ্ট পার্কের বাগান বাড়িটি বিক্রি করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এও আমি জানতুম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর এই হঠকারিতায় বাধা দিই, কিন্তু তখন আমি বিশেষভাবে অসুস্থ। আমার একাত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হয়েছে!

পরে খবর পেলুম ওই বাগানবাড়ি বিক্রি করার মস্ত কারণ ছিল তাঁর। তিনি জিতু ডাক্তারকে তার চিকিৎসক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। এ ছাড়া অন্য কারণও একটি ছিল। গ্রীষ্মপ্রধান এবং হতভাগ্য এই ভারতবর্ষের জল-হাওয়া নাকি কোন দিনই সুরমা দেবীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয়নি। সেইজন্য তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রতীরের নিরিবিলি একটি অঞ্চলে একখানি নিজস্ব ভিলায় তাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করতে চান। জিতু ডাক্তারও এদেশে প্র্যাকটিস করা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে গিয়ে তার চেম্বার খুলবে। ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় যাদু আছে, ফরাসী জাতি তার কতটুকু জানে? জিতু ডাক্তার সেখানে গিয়ে সুরমা দেবীর সহায়তায় একটি ওষধি গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে।

পরম্পরায় এই কথাটা আমার কানে এল, জিতু ডাক্তার নাকি ডাচেস্-অফ-উইণ্ডসরের লিখিত আত্মজীবনীটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে

শ্রীমতী সুরমা দেবীকে শুনিয়েছিলেন। ওতেই নাকি সুরমা দেবী বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

গত মাসে বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজযোগে ওরা রোমনগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। সমগ্র কন্টিনেণ্ট এবং ইংল্যাণ্ড পর্যটন করে অবশেষে ওরা দক্ষিণ ফরাসী অঞ্চলে গিয়ে পৌছবে। ভূমধ্যসাগরের উত্তর প্রান্তে সেই সময়টায় বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটবে।

* * *

নয় মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোমেন শান্ত মূর্তিতে যখন সামনে এসে দাঁড়াল,—আমি তখন শয্যাগত। জন দুই নামকরা চিকিৎসক আমাকে দেখছিলেন। রাধাপদর কাছে শুনেছিলুম, ডাক্তার দু'জন নাকি এবার একটু চিন্তিত।

সোমেন আমার পায়ের ধূলো নিয়ে আমার শীর্ণ চেহারটাকে যখন পর্যবেক্ষণ করছিল তখন আমি ঈষৎ ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, মিলির ছেলেটাকে পরের বাড়িতে আর কেন ফেলে রাখবি, ওটাকে এবার নিয়ে আয়, সোমেন। ওকে বড় করে তুলবি, সেই তোর সকলের বড় কাজ!

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সোমেন বলল, তাই হবে, দাদু।—এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুপুরের দিকে সে যখন ফিরে এল, তখন সে একা নয়। সঙ্গে এসেছেন সস্ত্রীক হরিমোহন, পুষ্পলতা, চারু এবং মিলির ফুটফুটে শিশু পুত্রটি। মায়ের মতো বড় বড় নীলাভ চোখ পেয়েছে, বাপের মতো পেয়েছে কালো কোঁকড়া চুল। হারামজাদা খাঁটি গরুর দুধ খেয়ে একেবারে শিশুদানব হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হবার পর হরিমোহনদের বাড়িতে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

কি নাম রাখলি, চারু?

আমার দিকে চেয়ে চারুর বোধহয় ঠোঁট কাঁপছিল। এবার গলা পরিষ্কার করে শুধু বলল, সোমনাথ!

বাচ্চাটা বোধহয় কোনও অজানা আশঙ্কায় একটু জড়োসড়ো হয়েছিল। এবার সে চারুলতার কোল ঘেঁষে আঁচল ধরে শক্ত হয়ে রইল। অতএব হরিমোহন এবং তাঁর স্ত্রী বললেন, আমরা আগাগোড়া সব শুনেছি, বেহাই মশায়। আপনার সঙ্কোচের আর কোনও কারণ নেই। আপনি এবার ভাল হয়ে উঠুন, সেই আমাদের আনন্দ!

চারু আমার পায়ে হাত রেখে বসেছিল। আমি বললুম, আর কেন তুই পরের বোঝা বইবি ভাই, যার ছেলে তাকে দিয়ে দে!

চারু বলল, তুমি একদিন একে আমার হাতে দিয়েছিলে মানুষ করে তুলতে। পরের বোঝা বলে ত দাওনি, দাদু?

সোমেন আমার মাথার কাছে নতমুখে বসেছিল। আমি বললুম, বুঝলে বেহাই, একদিন আমিই বলেছিলুম মিলিকে, তুই আর সোমেন আমার এখানেই থাক্—ওরা শোনেনি, ওদের আত্মাভিমান অন্যের সাহায্য নিতে চায়নি! আজ আমি তার শোধ নিয়ে যাচ্ছি। আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক বানিয়ে গেলুম মিলির এই বাচ্চাটাকে। চারু আর সোমেন রইল এর ট্রাষ্টি!

সোমেন বলল, এ তুমি কি করলে, দাদু?

কেন, হয়েছে কি! এ সম্পত্তি ত আমারও কুড়িয়ে পাওয়া রে!—আমি বললুম, এটুকু পেলে যদি মিলির আত্মার শান্তি হয়, মন্দ কি?

চারু চোখের জল ফেলছিল। বাচ্চাটা এতক্ষণ একটু খুঁৎ খুঁৎ করছিল দেখে তাকে তুলে নিয়ে হরিমোহন এবং তাঁর স্ত্রী বাইরে শান্ত করবার জন্য নিয়ে গেলেন।

আমি ডাকলুম পুষ্পলতাকে। বললুম, এটা তোমার কেমন লাগছে, পুষ্প? ছেলেটাকে ছাড়ব না অথচ তার বাপকেও স্বীকার করব

না—এ কি কখনও হয়? তোর অনেক আছে, চারু। তোর গ্রামের ইস্কুল, কলেজ, তোর লাইব্রেরী, তোর দাতব্য, তোর ওই বিপুল সম্পদ—তোর চারদিকে জীবনের নানা সমারোহ! কিন্তু ওই ছোঁড়াটা, ওই সোমেন,—ওর যে আর কেউ রইল না! ওকে ওর বাপের মতনই আবার সেই একা অন্ধকারে ওই শিশুকেই নিয়ে সাধনায় বসতে হবে। ওকে কেন তুই বঞ্চিত করতে চাস, ভাই?

আমার পাঁজরের পাশে মুখ লুকিয়ে চারুলতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বলল, আমাকে তুমি পথ বলে দাওনি কেন, দাদু?

হাসিমুখে বললুম, সোমেন তোকে তার সন্তানকে দান করেছে! আমি যদি সোমেনকে তোর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাই,—তুই নিবিনে?

চারু জবাব দিতে পারল না। আমি সোমেনের দিকে চেয়ে ধমক দিলুম,—ওরে ষ্টুপিড, আবার চোখের জল ফেলছিস? পুরুষ মানুষ হয়ে সংযম ভুললি? ভয় কি তোর? অশরীরি মিলি থাকবে না তোদের মাঝখানে! সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! মাঝখানে শুধু থাকবে ওই বাচ্চাটা—ওই যার নাম রাখল চারু—সোমনাথ। পুষ্প, এ কি আমি অন্যায় বললুম, ভাই?

পুষ্পলতা বলল, না, দাদু, এ খুব ভালই হয়েছে!

তবে ওদের দুজনের হাত মিলিয়ে দাও, পুষ্প। আমি দেখি!

পুষ্পলতা উঠে এসে দু'জনকেই তুলল। তারপর চারুর হাতখান নিয়ে সোমেনের হাতের মধ্যে রাখল! এবার হাসিমুখে বললুম, আমার অন্তিমকালের লগ্ন তোদের পক্ষে শুভ হোক, এই আশীর্বাদ জানিয়ে যাই! তবে হ্যাঁ, পরজন্মে আমি বিশ্বাস করি ভাই, পুষ্পলতা!

কেউ কথা বলল না। আমি পুনরায় বললুম, শুধু দু'জনের হাত মিলিয়ে দিয়েই ছুটি নিচ্ছিনে, পুষ্প। এই কামনা রেখে যাই, এর

পর চারুর কোলে আমি যেন সন্তান হয়ে ফিরে আসি! সত্যি বলছি পুষ্প, মিলিকে ছাড়তে হল সে-ব্যথা ভুলিনি,—চারুকেও ছেড়ে যেতে হচ্ছে এও সইছে না!

ছু'জনের ছু'খানা ঠাণ্ডা হাত পরস্পরকে ধরে রয়েছে দেখতে পাচ্ছিলুম। পুষ্পলতা বলল, দাছু, আমি চারুর হয়েই বলছি, আপনি ওর সেই দলিলখানা বার করতে বলুন,—এখানে বসে চারু ওখানা নিজের হাতেই ছিঁড়ে ফেলুক—

ঠিক বলেছিস, ভাই। এই নে চাবি, ওই দেরাজ থেকে বার ক'রে দে।

পুষ্পলতা উঠে গিয়ে দলিলখানা ব'ার ক'রে এনে চারুর সামনে রাখল। আজ আবার ওদের নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হচ্ছে! প্রথমবারে চোখের জল পড়েছিল একজনের,—আজ ছু'জনের।

সোমেন হেঁট হয়ে আমার গলার কাছে মুখ লুকিয়ে তার রুদ্ধ কান্নাটাকে গোপন করতে চাইছিল। চারুলতা দলিলখানা নিয়ে এবার ছিঁড়ে ফেলে বলল, দাছু, আমি এখানে থেকে তোমাকে ভাল করে তুলব! আমাকে তুমি আর যেতে বলো না!

শোন মেয়ের কথা!—ঈষৎ শীর্ণকণ্ঠে আমি বললুম, যাবি কোথা তুই? এই বাড়িই যে তোর শ্বশুরবাড়ি, ভাই! এখানে যে তোর ঈশ্বরদত্ত অধিকার! এখানে তোর স্বামী, তোর সন্তান, তোর সংসার--

বেয়ান এসে ঘরে ঢুকলেন! হাসিমুখে সোমনাথকে চারুর কোলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, কারো কাছে থাকছে না,--একে রাখ, চারু। সেই থেকে কান্না নিয়েছে!

পুষ্পলতা এগিয়ে এসে আমার পাশ থেকে সোমেনের হাত ধরে তুলল। বলল, এসো ভাই, আমার কাছে গল্প করবে এসো!

সোমেন উঠে দাঁড়াল। পুষ্পলতা বলল, মা, এবার তুমি বাবাকে

ডেকে আনো। জামাইকে আশীর্বাদ কর।—এবার তুমি শান্ত হও, ভাই,—তোমার অনেক কাজ। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, সোমেন।

হরিমোহন এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাকে আশীর্বাদ করি, বাবা। তুমি শিক্ষিত, তুমি সুপণ্ডিত,—তোমার মতন সন্তানকেই আমার দরকার ছিল!

সোমেন এগিয়ে এসে একে একে সকলের পায়ের ধুলো নিল। চারুলতা তার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে মাথার ঘোমটা টেনে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। পুষ্পলতা এবার হাসিমুখে বলল, চারু, এতদিনের আশা আজ পূর্ণ হল! আমাদের কলেজের জন্যে বিনাবেতনে একজন প্রফেসর পেয়ে গেলুম!

সকলের মুখেই আনন্দের আভা ফুটল।

এ ঘরে আমি অপরিসীম তৃপ্তিতে এবার চোখ বুজলুম।—